স্নেহস্পর্শ

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

১লা বৈশাখ ১৩৩৪

All rights reserved.

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত।

ম্যানেজার, মাহুদ এণ্ড কোং।

সদরঘাট, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশকের নিকট এবং

লেখকের নিকট—পোঃ গফরগাঁও,

ময়মনসিংহ।

উপহার।

এই

শ্রী

উপহার দিলাম।

তারিখ । শ্রী

প্রিণ্টার
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মজুমদার।
হরিপ্রেস।
ভালুকা, পোঃ গোরীপুর।
ময়মনসিংহ।

উৎসর্গ।

সর্ব্বজন প্রিয়

জমিদার,

শ্রীযুক্ত শতদল বিহারী চাকলাদার,

সুহৃদ্বরকে,

আমার এই ক্ষুদ্র উপন্যাস,

ঐকান্তিক শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ,

উৎসর্গ করিলাম।

১লা বৈশাখ ১৩৩৪,
পূর্ব্ববাসিমুলিয়া, ঢাকা।

শ্রীসুরেন্দ্র।

বিজ্ঞাপন।

কবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল সেন
প্রণীত।

(১) অ.ণমা [কবিতা পুস্তক]......... ৸৹

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্রই বাহির হইবে।

(২) পুরাণ বাড়ী [সামাজিক উপন্যাস]...... ২৲

(৩) ঝড়া-ফুল [উপন্যাস]................ ১৷৹

(৪) ঊর্ম্মিকা [ছোট গল্প]................ ৷৹

(৫) রঙ বেরঙ [কবিতা পুস্তক]............ ৷৹

প্রকাশক—
শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত।
ম্যানেজার, মাহুদ এণ্ড কোং।
সদরঘাট, চট্টগ্রাম।

দুটো কথা।

"ব্রহ্ম-স্পর্শ" উপন্যাস ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। উহাই সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

যাঁহাদের আগ্রহে, যত্নে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এই শুভ সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

১লা বৈশাখ ১৩৩৯
পূর্ব্ব-সিমুলিয়া, ঢাকা। — সুরেন্দ্র

ত্র্যহস্পর্শ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আট বৎসরের ছেলে কিরূপে মানুষ হইবে, কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, কে-ই-বা তাহার মুখের দিকে তাকাইবে, তাহার কোনই বন্দোবস্ত না করিয়া, জনক জননী উভয়েই যখন একে একে নির্দ্দয়ের মত জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া, সমস্ত দায়ীত্ব কাটাইলেন, তখন নিঃসহায় ননীবাবু হরিনারায়ণ বাবুর কণ্ঠলগ্ন হইতে বাধ্য হইলেন।

হরিনারায়ণবাবু গ্রামের তালুকদার। অনেক তালুকদারের ন্যায়, তিনি প্রজার রক্ত শোষিয়া, সংগৃহীত অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ উন্মুক্ত করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। প্রজাবর্গের উন্নতি কল্পে, প্রতিবৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। জলাশয় খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। নিঃসন্তান হইলেও তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ও সম্পত্তি উৎসন্নে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। গ্রামে দীন দুঃখীর জন্য অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া,— বহু লোকের অন্নের সংস্থান করিয়া ছিলেন। অতিথিশালা পরিচালনের জন্য বহু অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন।

ননীবাবু যখন বুঝিলেন,— এই পৃথিবী হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার স্থান নহে,— বহু বিপদ বুকে করিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, অস্তিত্ব

বজায় রাখিতে হয়;— এখানে শোক সহ্য করিয়া, দৈন্যের পদ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া, অপমান অগ্রাহ্য করিয়া, বহু ঝঞ্ঝাটের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া জীবন পরিচালনা করিতে হয়,— তখন তিনি হরিনারায়ণ বাবুর সাহায্য সহায় করিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি, এ পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

ফল বাহির হইবার পর এক পক্ষ অতিবাহিত না হইতেই, হরিনারায়ণবাবু সন্ন্যাস রোগে একদিন ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। সংসারের সেই সর্ব্বহারা শোকের বেগে মুহ্যমানা হইয়া, সাতটি দিবস অতিবাহিত না হইতেই, তাঁহার পত্নী পরলোকে যাইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বিস্তর সম্পত্তি দেখিয়া, হরিনারায়ণবাবুর দূর সম্পর্কিত বহু আত্মীয়, বান্ধব, বান্ধবের বান্ধব,— তস্য বান্ধবের আবির্ভাব হইল। সম্পর্কের দাবী করিয়া অনেকেই চোখের জলের বাঁধ ছাড়িয়া দিল,

এবং বিস্তৃত সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থ জোঁকের ন্যায় আকড়াইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে ননীবাবু আবার নিরাশ্রয় হইয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ননীবাবুর বুকের ভিতর দারুণ অশান্তি তুমুল হইয়া উঠিল। চিন্তায়, সেই গুরুভারাতুর শরীর মন লইয়া, জীবনযাত্রা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। জীবনের শেষ অবলম্বন হারাইয়া তাঁহার অন্তরে, পরস্পর বিরোধী অজস্র চিন্তা জাগিয়া উঠিল। ননীবাবু কর্ত্তব্য বিমূঢ়-চিত্ত লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। শেষে সেই সর্ব্বগ্রাসী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই, বিপরীত ভাবের তরঙ্গ চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া, এক অসীম মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল। ননীবাবু কলিকাতা নিবাসী ধনী, রমেশবাবুর বাসায় "টিউসনির" ব্যবস্থা করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রমেশবাবু ননীবাবুর ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ

হইয়া গেলেন— এবং নিজের পুত্রের ন্যায় সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

রমেশবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা ঊষালতাকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিয়া ননীবাবু বিশেষ সংযত চিত্তে স্বীয় কর্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন।

ঊষা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। দেখিতে ফুলের মত কোমল, দুধে আল্‌তা মিশান গায়ের রঙ্‌, শিশির ধোয়া ফুলের মত রূপলাবণ্য। অন্যান্য কি— আর কিসের মত— আমরা ঠিক-ঠাক বর্ণনা করিতে অক্ষম। তবে তাহাকে দেখিলে কেবলি দেখিতে ইচ্ছা করে; — চকিত নয়নে,— নিমেষহারা হইয়া! বয়সের অসীম প্রভাবে ক্রমে উভয়ের মনের গোপন কোণে, এক নূতন আকাঙ্ক্ষা পরিপুষ্টি লাভ করিল। সেই অনবরুদ্ধ তন্ময়ত্ব ভাবাতিশয্যে উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

রমেশবাবু দেখিলেন,— কাজে অকাজে ঊষা ননীবাবুর সঙ্গ সুখের অভিলাষে উদ্‌গ্রীবের ন্যায় থাকে; — আড়াল হইতে ননীবাবুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকার সময়, — সহসা কেহ মধ্যবর্ত্তী হইলে, স্বীয় ভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যে, ঊষা এমনি কিছু অপ্রাসঙ্গিক কাজ করিয়া ফেলিত, যাহার ফলে তাহাকে সকলের নিকট অপ্রতিভ বনাইয়া দিত! ননীবাবু ঊষার চিত্ত বিধুরতা লক্ষ্য করিয়া, আপনাকে সযত্নে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, — কিন্তু সময় সময় দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিয়া একেবারে লজ্জায় মুস্‌ড়িয়া পড়িতেন। এই প্রীতি-বিহ্বল-চিত্ত লইয়া উভয়েই যখন উভয়ের নিকট আর ধরা না দিয়া থাকিতে পারিল না, ঠিক সেই সময় রমেশবাবু উভয়ের উদ্বাহ কার্য্যের আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের পর রমেশবাবুর সাহায্যে ও আগ্রহে ননীবাবু বি, এল, পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একজন

সঙ্গতিপন্ন লোককে অভিবাবক স্বরূপ লাভ করিয়া, তাহার চিত্তের চিন্তা স্রোত উল্টা হাওয়ায় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কলিকাতা, রমেশবাবুর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা। বাড়ীর সম্মুখে সুদৃশ্য উদ্যান, বহু পত্র-পুষ্পের উজ্জ্বল শোভায় মনমুগ্ধ করিত। "এটর্ণির" কাজ করিয়া, রমেশবাবু বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। রাজার হালে চলিতেন। তাঁহার আস্তাবলে বড় বড় ঘোড়া, ব্রুহাম ও "ল্যাণ্ড" ছিল। অতিমূল্যবান স্বদেশী ও বিদেশী জিনিষে শয়ন কক্ষগুলি সুসজ্জিত। রমেশ বাবুর বহু সন্তানই হইয়াছিল, কিন্তু যমের সহিত লড়াই করিয়া, মাত্র দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা, সংসারের অবলম্বন স্বরূপ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বড় পুত্র শশীমোহন জববালপুর ডিষ্ট্রিক্ট-ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন, — সাস্ত্রীক বাস করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ভূষণ কলিকাতা, এক কলেজের

প্রফেসারি করেন। এখনও বিবাহ হয় নাই—কন্যাকর্ত্তার গতায়াত চলিতেছিল।

বড় কন্যা নীহার বালার স্বামী যোগেশবাবু মেদিনীপুর ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। উমা-লতাই সর্ব্ব কনিষ্ঠা,— সুতরাং জনক জননীর অত্যন্ত আদরের।

ননী বাবু বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বি, এল, উপাধি ধারণ করিলেন। পাশের সঙ্গে সঙ্গে রমেশ বাবু জামাতার ভবিষ্যৎ জীবনের এক সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। গৃহিনী বামাদেবী জামাতার সাফল্যে গৌরবান্বিতা হইয়া, তাঁহার প্রশংসা শত মুখে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা হ্যারিসন রোডে, একখানা বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া,দুয়ারের সম্মুখে প্রস্তর ফলকে স্বীয় নামের শেষে বি, এল, যুক্ত করিয়া, ননীবাবু একটি বৎসর ঘরের খাইয়া, বার-লাইব্রেরীতে গতায়াত করিয়াও

পশার জমাইতে পারিলেন না। মাসের মধ্যে এক আধ দিন যদি কোন নাছোড়বান্দা মক্কেল নিতান্তই আসিয়া জুটিত, — যাহার এই নব্য উকিলটি না হইলে মোকদ্দমার একেবারে অঙ্গহানী হইয়াই পড়িবে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ননীবাবু কোর্টে গতায়াতের সুবিধা করিয়া লইতেন। ওকালতির ঠাঁট্ বজায় রাখিবার সমস্ত ব্যয় রমেশবাবু বহন করিতে কুণ্ঠা বোধ না করিলেও, ননীবাবু এরূপ ভাবে জীবন যাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। বাহিরের লোকের সহিত মেলা মেশা করিলে, কেহই টাকা দিবেনা, সকলেই হয়ত বন্ধুত্বের দাবী করিয়া পশার বিস্তারে ব্যাঘাত জন্মাইবে, — এই আশঙ্কায় ননীবাবু ঘরের বাহির বড় একটা হইতেন না। সর্ব্বদাই এক খানা আইনের বহি খুলিয়া, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, অসীম চিন্তা-শীলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি

ভাড়া করিয়া, চৌরঙ্গির রাস্তায় সাস্ত্রীক সান্ধ্য বায়ু সেবন সুখ উপভোগ করিতেন।

তিনটি বৎসর এই অবস্থায় কাটাইয়া যখন কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন ননীবাবু চাকুরীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। শেষে শ্যালক শশীমোহনবাবুর "সুপারিশে" নাগপুর যাইয়া একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে হেড্ এসিষ্টেণ্টএর কার্য্যে ভর্ত্তি হইলেন। নাগপুরে ননীবাবু, বাসা করিয়া, ঠাকুর, চাকর লইয়া বাস করিতেন। ঊষা পিত্রালয়েই বাস করিত। ননী বাবু মাঝে মাঝে ছুটী উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রবি অস্তাচলে গিয়াছিল। পশ্চিম আকাশের তলদেশে ভাসমান কতকটা স্বর্ণবর্ণ, কতকটা রক্তবর্ণ

মেঘ ছন্নছাড়ার মত আত্মপ্রকাশ করিয়া, দেখিতে দেখিতে ফিকা হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই পূর্ব্বাকাশ চন্দ্রের আলোয় হাসিয়া উঠিল। দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশ মাত্র ছিলনা। বিদ্যুৎ চালিত পাখার নীচে,—ঊষা নীরবে বসিয়া ছিল। গবাক্ষের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার রজতধারা প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়া, ঊষার ফুল্ল বদনকমলে মাখামাখি করিতে লাগিল। নীল-আকাশে, চাঁদের পাশে, ছিট্‌কান নক্ষত্রগুলি প্রাণপণে জ্বলিয়াও, তাহাদের ঔজ্জ্বল্য বিস্তারের সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। চাঁদের আলোর সহিত যেন ধরা পড়িয়া হীন-প্রভ হইয়া যাইতেছিল। আকাশে, বাতাসে সম্মোহ শক্তির বিশেষ কোন উপাদান যদিও ছড়ান ছিলনা,—তথাপি ঊষার অন্ত-রের তারে এক অজ্ঞাত সুরের মঞ্জুল রাগিণী যে ঝঙ্কৃত হইতেছিল,—ইহা যেন তাহার চঞ্চল দৃষ্টির ভিতর দিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল।

উষা ঘরের বৈদ্যুতিক আলোর "সুইচ্" খুলিয়া দিতেই, সহস্র আলোর পুঞ্জীভূত দীপ্তিরাশি কক্ষের সজ্জিত আসবাবের উপর ছড়াইয়া পড়িল,—এবং চাঁদের কোমল আলোর ধারা বিতাড়িত করিয়া, স্বীয় স্মিত-শুভ্র-ধারা বিকিরণ করিতে লাগিল।

উষা একখানা পুস্তক আনিয়া পড়িতে বসিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত না হইতেই, যেন কোন চিন্তার অনাহুত আহ্বানে, সে চকিত দৃষ্টিতে ঘন ঘন বাহিরের পানে তাকাইতে লাগিল। তাহার যৌবন সুলভ চঞ্চল চাহনির ভিতর দিয়া,—এক বিশ্বগ্রাসী মনমাতানো ভাব ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময় সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া ননী বাবু, শ্বশুর মহাশয়ের "হল" গৃহের সম্মুখ দিয়া শয়ন কক্ষে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উষা ধড়মড়িয়া উঠিয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষু ঘুরাইয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "বড্ড দেরী করে এসেছ।"

ননী বাবু একটুকু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কাল যাব—সকলের সাথে দেখা করতেই একটুকু দেরী হয়ে গেল।" অতঃপর ঘড়ির পানে তাকাইয়া বলিলেন "হুঁ— সাড়ে আটটা — তা বেশী রাত কি-ই হয়েছে ?"

উষা স্বামীর মুখের পানে মধুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল "কাল যাবে — গরজ আমারই বেশী — নয় ?"

ননী বাবু সহাস্যবদনে উষার গলা জড়াইয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন।"

উষার মুগ্ধ অন্তরের স্বপ্নবিভোর সুখ-স্রোত যেন এক মুহূর্তে বাঁধহারা হইয়া ছুটিয়া চলিল। বক্ষ শোণিতে যেন সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গের মতই উত্তাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তাহার শরীরে যেন শত শত তড়িৎ শিখা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার দেহ, মন, আত্মা যেন, সেই সুখস্পর্শে, প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া, সুধার স্রোতে

তলাইয়া — সুধামাখা হইয়া গেল। ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত তন্দ্রাভিভূতবৎ আড়ষ্ট থাকিয়া স্মিত হাস্যে বলিল" ছিঃ — ছাড় — মা এক্ষনি এসে পরবেন।" বলিয়া ঊষা সজোরে মুক্তি লইয়া এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

ননী বাবু নিতান্ত অপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন "মা এখন আসবেন কেন ?"

"তুমি চলে যাবে — তাই গল্প-গুজব কর্ত্তে আসবেন, — একথা তিনি জানিয়ে ছিলেন, তুমি বেড়িয়ে ফিরে এসেছ তা তিনি এতক্ষণ হয়ত জানতে পেরেছেন। হঠাৎ আসলে কি ভাববেন ?"

ননী বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এই কথা ? — তা কি-ই-বা আর ভাববেন, — নূতন কিছুইত আর নয় !"

ঊষা মুচকি হাসিয়া বলিল "যাও - তুমি ভারি দুষ্ট।"

"কোথায় যাব ? — আজ রাত্রিতেই যেতে বল্‌ছ নাকি ?"

ঊষা অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তা বুঝি বল্‌ছি ?"

"তবে কি বলছ ?"

"কি বল্‌ছি জান্ ? — আমাকে এবার তোমার সাথে নিয়ে যেতে হবে, — বুঝ্‌লে ?"

ননীবাবু ইজিচেয়ারে বসিয়া — পা দুইখানি ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন "এই কথা ? — তা এবার হয়ে উঠ্‌বেনা।"

কথা শুনিয়া ঊষার বুকের ভিতরকার আশা। ক্ষীণ-শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া — যেটুকু তীক্ষ্ণ-ব্যথা মোচড় দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল, তাহাকে আড়াল করিয়া সে ননীবাবুর মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃস্বহায়ের মত তাকাইয়া রহিল। শেষে চোখ দুইটি নীচু করিয়া মাথা নাড়িয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল "আমি যাবই — যদি ফেলে যাও — তবে জব্দ হবে বল্‌ছি।"

হাসি মুখেই একটুকু উত্তেজনার সহিত ননী বাবু বলিলেন - "সে কি ? – স্নেহলতার মত নাকি ?"

উষা আরক্তমুখে, সলাজ ভাবে, স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল "বালাই – তা' হবে কেন ? ঢেঁচ্‌ড়া পোড়া হয়ে মরতে যাব কেন ? এ-ভাবে মরাটা খুবই সুখের কিনা ?"

ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন "তা – আজ-কাল ঐ একপথ আবিষ্কার হয়ে গেছে, কলম্বসের পরেই দ্বিতীয় আবিষ্কার। ভাবতেই মন শিহরে উঠে।"

উষা উত্তেজিত স্বরে বলিল "সে কি আর ইচ্ছে করে এমন করে ছিল ? সমাজই-ত জোড় করে এরূপ করতে বাধ্য করেছে !"

"তা সমাজ এত বড় অন্যায় চিরকাল ধরেই করে আস্‌ছে। পুড়ে মরলেই কি প্রতিকার হবে ? যত দিন সমাজের ভিতর মনুষ্যত্ব সাড়া না দিবে, –

এসব ব্যবস্থায় কেহ লজ্জা বোধ না করবে,—ততদিন পুড়ে মরলেও কিচ্ছু হবে না! যদি মেয়েরা শরীরে শক্তি জড় করে, পণ দিয়ে বিয়ে বসবার বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে, মেয়েদের একটা সত্বা বোধ রয়েছে তা ভালরূপ প্রতিপন্ন করাতে পারে, তবে এর প্রতিকার হবে,—নচেৎ নয়।"

"তাদের মনে আগুন জ্বল্‌লেও যে তারা মুখ ফুটে এসব কিছু ব্যক্ত করবার মত সাহস পায় না! যাঁ'রা নেতা—তারাই যদি সমাজের বুকে এতবড় দুর্ণীতির আসন পেতে, বুক ফুলাতে থাকেন, সে অবস্থায় মরণ ছাড়া আর কোন পথ নে-ই।"

ননীবাবু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "এসব সমাজ তত্ত্ব নিয়ে আমার কাজ নেই, কিসে জব্দ করবে, তাই বল না?"

ঊষা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "তা মশায়! এখন বল্‌ছিনা, বল আমাকে সঙ্গে করে নিবে কিনা?"

"তবে আমিও রাগ করে বসে রইলুম, কথা কইব না।" বলিয়া ননীবাবু মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

এই ভাবে প্রায় পনর মিনিট কাটিয়া গেল। উভয়েই নীরব, —যেন একটা অসীম নির্জ্জনতা তাহাদের দাম্পত্য বৈঠকে আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মস্‌গুল হইয়া রহিয়া ছিল। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ঊষা একগাল হাসিয়া— স্বামীর গলা জড়াইয়া বলিল "কাল যাবে — আজ রাগ করবার সময় কোথায় ?"

ননীবাবু স্মিত-আস্যে বলিলেন "তবে বলই না।"

সঙ্কোচে মৃদু স্বরে ঊষা বলিল "বলি গো-বলি—কথাটা কি জান ? এই তোমার —।" বলিয়া ঊষা হাসিয়া নীরব হইল।

ননীবাবু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন "বাঃ—বেশ্ বল্‌লে কিন্তু নীরব ভাষায় !"

চক্ষু ঘুরাইয়া ঊষা বলিল "মাগো মা — না বল্‌লে আর রক্ষা নেই-ই ! কথাটা কি শুন্‌বে ? এই তোমার নিকট চিঠি না লিখে একেবারে ঘাট হয়ে বসে থাকা আর কি !"

ননীবাবু বেশ ধৈর্য্য সংহত নির্ব্বিকার চিত্তেই সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "বটে ? এই কথা—

আমিও তা হলে তোমার নিকট চিঠি নাই বা লিখ্‌ব।”

উষা একটুকু অপ্রস্তুতের ভাব দেখাইয়া মুস্‌ড়িয়া পড়িল। সমস্ত মুখ-মণ্ডল মুহূর্ত্তে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। শেষে আত্ম গোপনের জন্য মুখ হেঁট করিয়া, স্বীয় আঁচলটা উভয় হস্তে ধারণ করিয়া সলাজ হাস্যে বলিল “খবর্দ্দার, তা কিন্তু করোনা বল্‌ছি। আমার একশ’বার ঘাট মেনে নিলুম, আমি আমার কথা তুলে নিলুম, —বুঝ্‌লে? রোজই একখানা করে চিঠি লিখ্‌বে,—বল লিখ্‌বে?” বলিয়া উষা আগ্রহ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের-পানে তাকাইয়া রহিল।

“আচ্ছা অবস্থা দেখে পরে যা’ হয় ব্যবস্থা করা যাবে। সত্যি তুমি যেতে চাও?”

উষা মৃদুকুণ্ঠিত-স্বরে বলিল “সত্যি বল্‌ছি— দু’শ বার বল্‌ছি,— তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে ভাল লাগে না। এই কয়টা দিন যেন ঝট্‌ করে কেটে গেল। দিদিকে দিয়ে মাকে বলালে, তিনি সম্মতি দিবেন। বল দিদিকে বল্‌বে কি না?”

উষার আনন্দোজ্জ্বল মুখের ভাব দেখিয়া ননীবাবু অন্তরে অন্তরে বেশ একটা গর্ব্ব অনুভব করিতে

লাগিলেন। তাহার এতদিনের সাধনা যেন সাফল্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে চাহিতেছিল। ননীবাবু স্নেহ করুণা নেত্রে ঊষার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন "আচ্ছা, বলে দেখ্‌ব এখন।"

আরও অর্দ্ধঘণ্টা কাল নানা গল্প ও হাস্য কৌতুকে কাটাইয়া দিয়া ননীবাবু নৈশ ভোজনের জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোর সাতটায় প্রাতরাশ শেষ করিয়া ননীবাবু নাগপুর যাত্রা করিবার সমস্ত জিনিষ-গুছাইতে লাগিলেন।

ঠিক এমনি সময় নীহারবালা ওরফে দিদি

ননীবাবুর সম্মুখীন হইয়া ঔদাস্যব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "ননি ! তোমার আবেদন অগ্রাহ্য।"

নীহারবালা উষালতা অপেক্ষা চারি বৎসরের বড়। সে এখন বর্ষা-বারি পূর্ণা উন্মত্তা স্রোতস্বিনীর মতই পরিপূর্ণ শ্রীধারণ করিয়াছিল। তাঁহার হেম-গৌর-তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা ও মসৃণতা যেন দেবতার নিপুণ হস্তের রচনা করা দেবী মূর্ত্তির মতই অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ-হাসি বিজড়িত চঞ্চল নেত্রযুগল সরল সঙ্কোচে সর্ব্বদা নত হইতে চাহিত। গণ্ডের লালিমা গোলাপের বর্ণ হইতেও গাঢ়তর হইয়া ফুটিয়া উঠিত।

ননীবাবু আশঙ্কা উদ্বেলিত, উত্তেজিত শরীর মন লইয়া নীহার দিদির প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া বলিলেন "সে কি ? অমতের কি কারণ হ'তে পারে ?" ননীবাবুর কণ্ঠে বিস্ময়ধ্বনিত হইল।

নীহারবালা নিতান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আজ ত্র্যহস্পর্শ,— দিন বড়ই অশুভ,—এমন দিনে

যাত্রা কত্তে শাস্ত্রকারেরা নিষেধ কচ্ছেন। কাল যেতে পার।"

ননীবাবু অধিকতর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ত কি হয়? আজ আমাকে যে করেই হয় যেতেই হবে। অনেক জরুরী কাজ রয়েছে। পর্শু কাজে হাজির হতে না পারলে খুবই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ঐ তারিখে হাজির হব, এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই বড় সাহেব ছুটী মঞ্জুর করেছেন।"

নীহারবালা সকৌতুকে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "একান্ত ঠেকা হলে—না হয় তুমি যেতে পার। ঊষা কিছুতেই যেতে পারে না। তুমি এই কয়দিন বৈ—আসনিত।"

ননীবাবু স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্য ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আমি ত্র্যহস্পর্শ মেনে চলি না। এসব হল গিয়ে **Superstition** মাত্র! বাঙ্গালীরা দিনরাত এই বাঁধার মধ্যে বাঁধা রয়েছে বলেইত একেবারে দিন দিন "কূপ-মণ্ডুক" হচ্ছে।"

নীহারবালা অধীর উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বলিলেন তা নয় ননি! মেনে চলার বিশেষ আজ্ঞা রয়েছে।

কুদিনে যাত্রা করিলে পদে পদে অমঙ্গল ঘটে থাকে। মা অনেক চিন্তা করে শেষে আপত্তি করেছেন।”

ননীবাবু একটুকু ব্যঙ্গসহকারে বলিলেন “বিলাতের তা’রা কৈ, — এসব ত মেনে চলেনা, — কৈ, তাদের কখনও কোন বিপদ হতে শুনাযায় না।”

নীহারবালা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন “হয় কিনা — তা কি কখনও তুমি খোঁজ করে দেখেছ? সে দিন “উনি” বল্লেন — তাঁদের বড় সাহেব কোথায়ও বেড় হবার পূর্ব্বে পঞ্জিকা দেখে, — মঘা নক্ষত্র বাদ দিয়ে তবে যাত্রার সময় নির্দ্ধারণ করেন। কোন বাঙ্গালীর নিষেধ অবজ্ঞা করে,—তাঁর পিতামাতা মঘা নক্ষত্রে সমুদ্র পথে যাত্রা করেছিলেন। দৈব বিড়ম্বনায় সেই জাহাজখানা ডুবে যাওয়ায়,—তাঁরা প্রাণ হারিয়েছিল। এখন ঠেকে, সাহেব বিশেষ ভাবে মঘা নক্ষত্র মেনে চলেন। বাঙ্গালীরা সাহেবদের অনুকরণ কর্ত্তে ব্যস্ত,—কিন্তু তাঁদের ভিতর যেটুকুন ভাল,— তা নিয়ে বড় মাথা ঘামাতে চৈষ্টা করে না। শুধু অশন, ভূষণ, ধরণ, ধারণ, নকল করে কোন জাতিই

বড় হতে পারেনা। চাই মানুষ গড়ে তোলার খাটী পথ নির্ণয় করা। মনুষ্যত্ব বিকাশ না হলে, শুধু চলা ফেরার ধারাগুলি নকল করে, বিপদই ডেকে আনছে।"

ননীবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "আপনি অনেক দুর চলে গেলেন দেখ্‌ছি,—তা সে সব বিষয় আলোচনা কত্তে গেলে অনেক কথাই বল্‌তে হবে। তবে মঘা নক্ষত্রের বিষয় যা বল্লেন,—সেসব গল্প কথা। আদৌ তারা এসব মেনে চলে না। ঠিক বল্‌ছি, যাত্রা কর্‌লে কিছুই হবে না। এছাড়া যদি আর কোন আপত্তি না থাকে তবে সঙ্গে করে নিয়ে যাব মনে কচ্ছি।"

নীহারবালা প্রীতিপ্রসন্ন চোখের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি ননীবাবুর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন "যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়—তবে তোমার নাক কাণ আর রাখ্‌বই না,—তা কিন্তু বলে দিচ্ছি। কিছু হলে,—তোমার সাহেবি চাল একেবারে ভেঙ্গে দেব—বুঝ্‌লে ?"

ননীবাবুর কণ্ঠে অখণ্ডনীয় যে সত্যের সুর ঝঙ্কার দিয়াছিল, তাহার উৎকণ্ঠিত আগ্রহের মধ্যে সহজ সত্যের যে অমিশ্ররূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে প্রত্যাহার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি বিজয় গর্ব্ব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা পরে দেখেনিবেন। মাকে রাজী করবার ভার রইল আপনার উপর। ঊষার যে অবস্থা তাতে যদি রেখে যাই,—তবে একটা লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে বস্‌বে।"

নীহারবালা একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "এসমস্ত যে তোমার অন্তরের কথা নয়ই, এটা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এযে সময় উপযোগী চাল—এটা বুঝ্‌তে আমার বাকী নেই। তা তুমি যতই বক্তৃতা কর না কেন,ত্র্যহস্পর্শ মেনে চলাই নিরাপদ জনক।"

ননীবাবু স্মিত আস্যে বলিলেন "সে যা হক—ওদের মত আপনাকে করাতেই হবে,— অন্ততঃ বোনের মুখের দিকে চেয়েওত কত্তে হবে।"

নীহারবালা সহানুভূতি পূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ননী-বাবুর বিব্রত ও বিপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া চোখ

তুলিয়া স্মিত আস্যে বলিলেন "বাপ্‌রে—বাপ ! গরজ বড় বালাই, এত করেও পরিবার না নিলে নয়-ই ! দেখা যাক্ কি হয়।" বলিয়া নীহারবালা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

বেলা আড়াইটার সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ী হ্যারিসন রোডের উপর দিয়া গম্ গম্ শব্দে অতিক্রুত ছুটিতেছিল। গাড়ীর উপরে ট্রাঙ্ক, বিছানা, সাজান রহিয়াছিল। গাড়ওয়ান ক্রমাগত চাবুক নাড়িয়া, কিম্ভুত কিমাকার শব্দ করিতে করিতে, অশ্বযুগলের গতি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। খানিকটা অগ্রসর হইতেই, চিৎপুর রোডের মোড়, বিপরীত দিকে দ্রুত ধাবমান একখানা মোটর গাড়ীর চাকার সহিত গাড়ীর ধাক্কা লাগিল। গাড়ওয়ান্ বেগ সামলাইতে না পারিয়া গাড়ী হইতে পড়িয়া গেল। একটি ঘোড়ার পা' জখম হইয়া গেল। পথি পার্শ্বস্থ লোক-জন বিপদ আশঙ্কায় ছুটিয়া গাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল। ব্যাপার গুরুতর মনে করিয়া ড্রাইভার মোটরখানি দ্রুত চালাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে দৃষ্টির বহি-র্ভূত হইয়া গেল।

ননীবাবু মস্তকে আঘাত পাইলেন। একটুকু স্থির হইয়া — ঊষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ননীবাবু বলিলেন "তোমার বিশেষ লাগেনিত ?"

ঊষা ব্যস্ততার সহিত ননীবাবুর প্রতি লক্ষ্য কবিয়া বলিল "না, — তোমার কপাল যে ফুলে উঠেছে ! বড্ড ধাক্কা লেগেছে কিনা ! চল বাসায় ফিরে যাই, মাথায় জলপট্টি দিব এখন। তিথির দোষ হাতে হাতে ফলে গেল।" বলিয়া ঊষা ননীবাবুর কপালের ফুলা জায়গায় হাত বুলাইতে লাগিল।

ননীবাবু ঊষার প্রভা প্রদীপ্ত অনৈসর্গিক মুখের দিকে অনিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ঊষার ব্যবস্থা অকাট্য, প্রত্যেক কথাটি যেন অনির্ব্বচনীয় সত্য। আমার পক্ষে ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয়ে বাসায় ফিরে না যাওয়া নিতান্ত অস্তিত্বহীন, অনাবশ্যক খেয়াল মাত্র। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আত্ম পক্ষ সমর্থন করিয়া যুক্তির ধারাগুলি বদল করিয়া ফেলিলেন এবং ত্বরিত কণ্ঠে বলিলেন "ও কিচ্ছুনয় যাক্ অল্পেই কেটে গেল।"

ঊষা দৃঢ়-স্বরে বলিল "তা হবে না। চল ফিরে যাই, না গেলে, মা শুন্‌লে, খুবই রাগ কর্‌বেন। খারাপ দিনে যাত্রার ফল দেখ্‌লে.ত? কাল আস্‌তে কত করে বল্‌লুম, চাকুরীর এতে কি-ই-বা হত?"

নীহার দিদির কথাগুলি মনে পড়িয়া যাওয়াতে বাসায় ফিরিয়া যাইতে ননীবাবুর প্রবৃত্তি হইল না। দুঃখ ও নিরাশা বুকে টানিয়া ধরিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার অন্ত-রের লজ্জাতঙ্ক যেন এক জ্বালাময় ইঙ্গিতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া, এক অশরীরী ছায়া মূর্ত্তিতে তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। ননীবাবুর চারিদিকের বিশ্বসংসার যেন বিরাট লজ্জায় কালো হইয়া নিবিড় ছায়া-চিত্র অঙ্কিত করিল। ননীবাবু কয়েক মূহূর্ত্তে নীরবে থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ফিরে যাওয়া হবে না। নীহারদিদি শুন্‌লে ঠাট্টা করে তিষ্ঠিতে দিবেন না। ত্র্যহস্পর্শ-ত কেটেই গেল, আমাকে যেতেই হবে।"

ঊষা ব্যগ্রতার সহিত বলিল "তা তুমি ভেবনা ফিরে চল। কাল গেলেই চল্‌বে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ননীবাবু ঊষার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। একখানা "স্যাকড়া" গাড়ী ভাড়া করিয়া সমস্ত জিনিষ পত্র উঠাইয়া লইলেন। আহত কোচম্যানকে বাসায় গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, অপর কোচম্যানকে গাড়ী লইয়া বাসায় ফিরিতে উপদেশ দিলেন। স্বীয় মস্তকে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, সে কথা বাসায় প্রকাশ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, ননীবাবু ঊষাকে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঊষা বাক্য-বিমুখ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সর্ব্ব শরীর গভীর আতঙ্কে অনড় হইয়া গিয়াছিল।

হাওড়া ষ্টেসনে বোম্বে "মেল" দাঁড়ানছিল। পোনে চারিটায় "মেল" ছাড়িবে। যাহারা বিলম্বে টিকেট ক্রয় করিয়াছিল, তাহারা বসিবার স্থানাভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। প্রত্যেক কামরাই যাত্রীতে পূর্ণ তাহারি মধ্যে অনেকেই তুমুল বাক্য বিনিময়ের পর সামান্য দাঁড়াইবার স্থান লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। এমনি সময়ে ননীবাবু, ঊষাকে সঙ্গে করিয়া রিজার্ভ করা, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার নিকট আসিয়া দাঁড়াই-

লেন। অধিকাংশ জিনিষই “বুক” করিয়া গার্ডের সঙ্গে দিয়াদিলেন, অবশিষ্ট সামান্য জিনিষগুলি কুলীব সাহায্যে প্লাটফরমে আনাইয়াছিলেন। ননীবাবু গাড়ীর দরজার হাতল ঘুরাইয়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঊষাকে লইয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন। শেষে কুলীর সাহায্যে জিনিষগুলি যথাস্থানে সংরক্ষণ করিয়া বেঞ্চের এক পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া একটি স্বস্তির নিশ্বাস প্রদান করিলেন এবং ঊষার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন “বাঁচা গেল।”

গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিল। সকলেই ব্যস্ততার সহিত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িতে আর বাকী নাই, ঠিক এমনি সময়ে ঊষা উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার হ্যাণ্ড ব্যাগ ত গাড়ীতে দেখ্‌ছি না, গার্ডের সঙ্গে দিয়েছ নাকি ?”

ননীবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কামরায় এধার ওধার অন্বেষণ করিয়া ব্যাগের সন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুতে সমস্ত বিশ্ব যেন

আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল ! ননীবাবু এক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং "স্ত্যাকরা গাড়ীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই ননীবাবু দেখিলেন, গাড়ওয়ান তাঁহারি হ্যাণ্ডব্যাগ লইয়া, তাঁহারি দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গাড়ওয়ান ননীবাবুর সম্মুখীন হইয়া নম্র স্বরে বলিল "বাবু এই নিন্ আপনার ব্যাগ, আমি এখনই গাড়ীতে পড়ে আছে দেখলুম, গাড়ী ছাড়বারও দেরী নেই—তাই ছুটে আসছিলুম।"

ননীবাবু গাড়ওয়ানের হাত হইতে ব্যাগটি লইয়া, বক্শিস্ বাবদ তাহার হস্তে একটি টাকা অর্পণ করিয়া, "মেল" গাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। প্লেটফরমে আসিয়া তিনি দেখিলেন "মেল্" ছাড়িয়া দিয়াছে। সম্মুখে এসিষ্টেণ্ট ষ্টেসন মাষ্টারবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, ননীবাবু তাঁহাকে সমস্ত জানাইয়া গাড়ী থামাইতে অনুরোধ করিলেন॥ তিনি মস্তক নাড়িয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন "এখন থামান অসম্ভব।

গাড়ী **Distant Signal** পাড় হয়ে গেল। পূর্ব্বে আমাকে জানালে—আমি দুই এক মিনিট গাড়ী দাঁড় করায়ে রাখতে পারতুম। তা ভয়ের কিছু কারণ নেই, আপনি সাড়ে সাতটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাবেন এখন। আমি খড়্গপুর টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, ওখানে তা'রা আপনার স্ত্রীকে নামিয়ে রাখবে এখন।" অতঃপর তিনি টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়া মণীবাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল। বিজয়া দশমীর পর প্রতিমাহীন মণ্ডপের মতই, তাঁহার অন্তর শ্রীহীন নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। গভীর অনুশোচনায় ও আত্ম ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। যতই উষার স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার মুখ নিঃসৃত, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মিনতিপূর্ণ কাতর প্রার্থনা, সদ্য দেখা দৃশ্যের মতই জল্ জল্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। নিজের বুদ্ধির দোষে অথবা ভাগ্যের দোষে ঘটনাটি এমনি অপ্রতি-বিধেয় ও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই বিষয়

বাসায় ফিরিয়া জ্ঞাত করাইতে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সম্মুখস্থ গদিশূন্য ধূলিধূসরিত বেঞ্চের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া নীহারদিদির শেষ কথাগুলির প্রতিধ্বনী অনবরত তাঁহারই নিজের উভয় কর্ণে, ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। তাঁহার শরীরের শিরায় শিরায় নীহার দিদির কথার ঝাঁজ যেন আগুন হইয়া ধোঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কচিৎ নক্ষত্র খচিত আকাশ হইতে কেন্দ্রভ্রষ্ট এক একটা উল্কা, অগ্নিগোলকের ন্যায় ব্যোমপথ প্রদীপ্ত করিয়া, দেব-রোষাগ্নির রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার পানে যেন ছুটিতে ছিল। নৈশ শীতল বায়ু মন্দ গতিতে তাঁহার চিন্তা-ক্লিষ্ট ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল। ননীবাবু যতক্ষণ ষ্টেসনে অবস্থান করিলেন দিক্ দেশ-কাল সকলই তাঁহার অশরীরী সত্তায় ভরিয়া উঠিল এবং হৃদয় বিশাল-শূন্য-বিস্তীর্ণ মরুবৎ হাহাকার করিতে লাগিল। হায়! কত তুচ্ছ ঘটনার

উপর মনুষ্যের ভাগ্য বিপর্য্যয় নির্ভর করে, তাহা কয় জন খোঁজ করিতে চেষ্টা করে ?

ননীবাবু রাত্রি সাড়ে আট্‌টায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রা করিলেন। বহু সময় ষ্টেসনে বসিয়া কাটাইলেও, নীহার দিদির ভয়ে, বাসায় ফিরিয়া দুর্ঘটনার বিষয় জানাইতে সাহস পাইলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেন খড়গপুর ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। ননীবাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর "জনানা" বিশ্রাম কামরার দিকে অতিদ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঊষা তাঁহাকে দেখিয়া কি প্রশ্ন করিবে, তিনিই বা কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন তাহারি একটা খসরা মনে, মনে তৈয়ায় করিয়া চলিতে লাগিলেন। স্মৃতি বিজ-

ড়িত একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকে তাঁহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। "জনানা" কামরার নিকট উপস্থিত হইয়া ননীবাবু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, কামরাটি শূন্য, একটা গম্ভীর নির্জ্জনতা যেন কক্ষটিকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিলেন, একজন 'লেডি' টিকেট কলেক্টার নীরবে দাঁড়াইয়া প্যাসেঞ্জারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে। ননীবাবু ব্যস্ততার সহিত তাহার সম্মুখীন হইয়া, সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং প্রত্যুত্তরের আশায়,চকিত নেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ননীবাবুর অত্যাধিক ব্যগ্রতা লক্ষ্য করয়া'লেডী'টিকেটকলেক্টার একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া, সহানুভূতি সূচক স্বরে বলিলেন "বাবু! আমি এবিষয় কিছুই জানিনে। তবে কোন স্ত্রলোককে "মেল" গাড়ী হতে নামিয়ে এখানে রাখা হয় নি,"একথা আমি দৃঢতার সহিত বল্‌তে পারি। আপনি ষ্টেসন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে প্রকৃত উত্তর পেতে পারেন এরূপ আশা করি।"

উত্তর শ্রবণ করিয়া ননীবাবু একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখের কোণে জলস্রোত যেন প্রবল উচ্ছ্বাসে ঠেলা-ঠেলি করিতে লাগিল। একটা অপ্রত্যাশিত অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সমুদয় যেন ভূমিকম্পে নাড়া পাইয়া সজোরে দুলিতেছে। অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে তিনি ষ্টেসন মাষ্টারের কামরার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। কামরার দুয়ারের উপর ঝালরদার পর্দ্দা আঁটা। ঘরের মার্ব্বেলের মেজের উপর টেবিল, চেয়ার, কৌচ ইত্যাদি সাজান রহিয়াছে। দরজার এক পার্শ্বে একজন চাপরাশি, দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঝিমাইতেছিল। কক্ষের ভিতরে জনমানবের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া, ননীবাবু চাপরাশিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ষ্টেসন মাষ্টার ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। ননীবাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া এসিষ্টেণ্ট ষ্টেসন-

মাষ্টারের অনুসন্ধানে, গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই হেড্ টিকেট কালেক্টারের সাক্ষাৎ পাইলেন। ননীবাবু তাহাকে সমস্ত জানাইয়া প্রত্যুত্তরের আশায় তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। হেড্ টিকেট কালেক্টার বাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "টেলিগ্রাম" খানা অনেক দেরীতে এখানে পাওয়া গেছিল। "মেল" ছেড়ে যাবার পরে, না পেলে আমরা টেলিগ্রামের **action** নিতে পারতুম।"

ননীবাবু স্ফুর্ত্তিহীন বিষণ্ণ মুখখানা উত্তোলন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন "সে-কি মশায়! "মেল" ছাড়ার দশ মিনিটের ভিতরেই ত টেলিগ্রাম করা হয়েছিল,—দেরীতে পৌঁছার কারণ কি হতে পারে, তা-ত ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না!"

হেড্ টিকেট কালেক্টার বাবু ঝাঁকিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন:"তা'র কৈফৎ দিতে আমি বাধ্য নই। আপনি উপরে লিখতে পারেন। রেলের কর্ম্মচারী, এসব লিখা লিখিকে থোরাই কেয়ার করে থাকে!"

ননীবাবু প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া, জলভারাক্রান্ত শ্রাবণের নিবিড় মেঘের মতই স্তব্ধ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে সংযত স্বরে বলিলেন "মহাশয়! লিখা-পড়ার কোন কথাই ত হয় নি। আপনি কেন চটে যাচ্ছেন, তা'র কারণ ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না! আমি বিপদে পড়েছি, তাই আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করেও, সঠিক খবরটা জানতে চাইছি।"

টিকেট কলেক্টার বাবু ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন "অঠিক কোন কিছুই বলেছি বলেত ত মনে হয় না! এরূপ বিপদে পড়ে অনেকেই আমাদের নিকট এসে থাকে। সবটাতে মাথা ঘামাতে গেলে কি আমাদের রক্ষা আছে! "মাছের মার পুত্রশোক নেই," আমাদেরও তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটুকুন হুসিয়ার হয়ে চল্‌লেইত হয়, শেষে হাঁহুতস্মি করে মরতে হয় না।"

এই সহজ বিদ্রূপে ননীবাবু যেমনই ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিলেন, রাগেও তেমনি রঞ্জিত হইয়া নিম্নের ওষ্ঠখানি দন্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বুকের

রক্ত যেন অগ্নির ফুল্‌কির মত ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতে লাগিল। ননীবাবু নিজকে অনেকখানি সংযত করিয়া বলিলেন "সে বিষয়ে উপদেশে আর এখন কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না। এখন আমার কি করা উচিত তা-ই বলে দিন।"

টিকিট কালেক্টার বাবু বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিলেন "কর্ত্তব্য ? গাড়ীতে চড়ে, একেবারে স্বস্থানে প্রস্থান করুন, আপদ কেটে যাক্ ! আমাদের এত কথা কইবার সময় নেই-ই। শুক্‌নো আলাপে পেট ভরে না। আমরা রেলের লোক,—শিকারের মত শিকারের সন্ধান পেলে, বুঝতেই ত পাচ্ছেন !" বলিয়া তিনি হোঁ, হোঁ শব্দে কয়েক মুহূর্ত্ত হাসিয়া, ননীবাবুকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়া, ইণ্টারক্লাস গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

লোকটির ব্যবহারে ননীবাবু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। সংসর্গ দোষে মানুষ যে এতটা অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা তিনি এতদিন ধারণা, করিতে পারেন নাই। এখন প্রত্যক্ষ করিয়া, একটা

ঘৃণায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। ননীবাবু ধীরে ধীরে এসিষ্টেণ্ট ষ্টেসন মাষ্টারের উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর নিকট এসিষ্টেণ্ট ষ্টেসন মাষ্টারকে দেখিতে পাইয়া, বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তিনি ননীবাবুর দুর্ঘটনার বিষয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হাওড়া হতে আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে,—উহা হেড্ টিকেট কলেক্টারের নিকট দেওয়া হয়েছিল। হেড্ টিকেট কলেক্টারকে সঙ্গে করে আপনার স্ত্রীকে এখানে নামিয়ে রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়ে ছিল। তিনি তা কাজে ভুলে গেছিলেন, তজ্জন্য তাঁর কৈফৎ চাওয়া হয়েছে। তাঁর এই তাচ্ছিল্যের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত হয়েছি। "মেল" ছাড়ার পর যখন সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন আমরা রাস্তায় কোন স্থানে নামিয়ে রাখা নিরাপদ নহে, মনে করে, "গণ্ডিয়া" টেলিগ্রাম করে সমস্ত জানিয়েছি ও আপনার স্ত্রীকে তথায় নামিয়ে রাখতে উপদেশ দিয়েছি। "মেলের" গার্ডের নিকট টেলিগ্রাম করে, আপনার স্ত্রী যে কামরায়

আছেন, সেটা একেবারে তালাবন্ধ করে দিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য লোক ঐ কামরায় যাতে উঠ্‌তে না পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক ষ্টেষনেই খোঁজ কর্ত্তে জানান হয়েছে। কোন ভয়ের কারণ নেই। আপনি "গণ্ডিয়া" নেমে তাঁকে নিয়ে চলে যাবেন।"

প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া ননীবাবু আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। টিকেট কলেক্টারের দায়ীত্ব-হীন ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি মুসড়িয়া পড়িলেন। এতবড় অন্যায় করিয়াও, তাহার ঔদ্ধাত্যভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সমান্য ঠাট্টা বিদ্রূপের ভয়ে, নিতান্ত একগুঁয়েমীর জন্য তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। খারাপ দিনে যাত্রা করাটা যে ভাল হয় নাই, তাহা তিনি আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন।

মানুষের মন পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ হইয়া আজ যে কাজে অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করে না, ঘটনা চক্রে, অভিজ্ঞতার ফলে, সেই ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যই শেষে

অন্যায়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা আনিয়া দেয়। এই বিভিন্নরূপ বিচার, শক্তিসম্পদ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এই বিচার শক্তির প্রভাবে মানুষ কোন কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে, পরে পূর্ব্ব কার্য্যের ত্রুটী বাহির করিয়া দেওয়া আবার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়!

ননীবাবু ভাবিতে লাগিলেন—উষাকে রেখে এলেই ভাল হত। তার অনুরোধ রক্ষা কত্তে গিয়েই না এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল! সংসারে সকল অশান্তির মূলইতো ঐ নারী! কলিকাতা টেলিগ্রাম করে সমস্ত জানিয়ে দি,—না—তাতে কোনই ফল হবে না, সুধু আমার দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে! আমিইত "গণ্ডিয়া" যাচ্ছি—সেখানে যদি উষার কোন খোঁজ কত্তে না পারি, তখন যা হয় করা যাবে।"

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ননীবাবু গাড়ীতে উঠিয়া আসন গ্রহণ

করিলেন। তাঁহার অন্তরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। নানা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি জানালার ভিতর দিয়া মস্তক বাহির করিয়া দিয়া, মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন। কত বন, কানন, প্রান্তর পিছে ফেলিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু সে সমস্ত লক্ষ্য করিবার মত উৎসুক্য যেন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ঠিক এমনি সময় পার্শ্বস্থ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিয়া কে যেন প্রাণ খুলিয়া গাহিতে লাগিল

"মা গো! আমার এই ভাবনা,
আমি কোথায় ছিলেম, কোথায় এলেম,
কোথায় যাব নাই ঠিকানা।"

সেই সুমধুর সঙ্গীত লহরী বাতাসের সহিত মিশা-মিশি করিয়া দূর দিগন্তে ছুটা ছুটি করিতে লাগিল। সেই গীত লহরী যেন ননীবাবুর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া, এক অসীম উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া দিল।

পরদিন বেলা চারিটার সময় ট্রেনখানি "গণ্ডিয়া"

ষ্টেসনে পৌঁছিল। ননীবাবু ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট খোঁজ করিতেই তিনি পরম আগ্রহে বলিলেন "আপনার স্ত্রীকে এখানে নামিয়ে রাখা হয়ে ছিল।"

সেই আশার বাণী শ্রবণ করিয়া ননীবাবু যে শান্তি অনুভব করিলেন মরু মধ্যে বহুপথ-পর্য্যটন-ক্লান্ত পথিক, স্বচ্ছজল স্রোত দেখিলেও সেরূপ শান্তি অনুভব করে কিনা সন্দেহ। মনের শুষ্ক বিষাদ বিদূরিত করিয়া ননীবাবু আশা প্রদীপ্ত নয়নে ষ্টেসন মাষ্টারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় রেখেছেন?"

ষ্টেসন মাষ্টার স্মিতমুখে বলিলেন **Female waiting room**এ তিনি ছিলেন। জব্বলপুর হইতে তাঁর একজন নিকট আত্মীয় এখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি কলিকাতা যাচ্ছিলেন, আপনার স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বে, তিনি তাঁকে নিয়ে "মেলে" কলিকাতা চলে গেছেন। আপনাকেও প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে খোঁজ করবেন, এরূপ জানিয়েছেন।

মণীবাবু প্রত্যুত্তরে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "তাঁ'র নাম কি তা' কিছু জানতে পেরেছেন কি?"

ষ্টেসন মাষ্টার স্মিতমুখে বলিলেন "না—তা কিছু আমাকে বলেন নি। তাঁ'র সময়ও খুব সংকীর্ণ ছিল, আমিও সে বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করতে পারি নি। তবে তিনি যে আপনার স্ত্রীর খুবই একজন নিকট আত্মীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নেই [illegible]। আপনি নাগপুর পৌঁছে, একখানা টেলিগ্রাম করে, সমস্ত অবগত হ'তে পারবেন এখন।"

মণীবাবু চিন্তাবিজড়িত নেত্রে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কে তিনি নিকট আত্মীয়? তিনি নিতান্তই অপরিচিত হ'লে, উহা কখনও তাঁ'র সাথে যেতে চাইত না। আত্মীয়টি জব্বলপুর হ'তে আসছেন বলছে, শশীবাবুই ত জব্বলপুর থাকেন, যদি তিনিই হয়ে থাকেন, তবে আমার আসা পর্য্যন্ত তাঁ'রও এখানে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অন্ততঃ একখানা চিঠি লিখে ষ্টেসন

মাষ্টারের নিকট রেখে যাওয়া উচিত ছিল। এখন আমার কলিকাতা ফিরে যাওয়া সঙ্গত মনে করি না। যাক্ বাসায় পৌঁছে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।” অতঃপর নবীবাবু একটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, সন্ধ্যার ট্রেনে নাগপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাসায় ফিরিয়া, “আমার কোন টেলিগ্রাম এসেছে?” প্রশ্ন করিয়াই নবীবাবু চাকরের মুখের পানে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

“আজ্ঞে না।” বলিয়া চাকর এক পার্শ্বে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল।

ননীবাবু একটী দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। শেষে রমেশ বাবুর নামে একখানা আর্জেণ্ট, রিপ্লাই-পেড্ টেলিগ্রাম লিখিয়া, টাকা সহ, চাকরের হস্তে প্রদান করিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন "যাও শীঘ্র এই টেলিগ্রাম করে এস।"

চাকর চলিয়া গেল। চলন্ত মেঘের আড়ালে নিপতিত রবি করের প্রভার মতই ননীবাবুর মুখের সমুজ্জ্বলতা, একেবারে ম্লান ও মসীময় হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া প্রলয় রজনীর ভয়াবহ দুর্য্যোগের ন্যায় এক অপরিসীম চিন্তার তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বেলা দশটা বাজিতেই ননীবাবু আহারের পর, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, অফিসের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রায় সাড়ে দশটার সময় বড় সাহেব মিঃ আয়াঙ্গারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ননীবাবু স্বীয় বিপদের বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন।

স্থূত, মাখনে স্ফীতোদর মিঃ আয়াঙ্গার, আড়াই হস্ত পরিমিত চেয়ারে উপবেশন করিয়া সকল কথা

শুনিলেন, শেষে জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আপনি ফিরে এসে, এরূপ একটা কিছু বল্‌বেন তা আমি পূর্ব্বেই ধারণা করে রেখে দিয়েছি। আপনার দায়ীত্ব-জ্ঞান নেই বল্‌লেই হয়। কাজের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেল। এজন্য আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

কথা শুনিয়া নন্দীবাবুর চক্ষু দুইটি অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। সেই জল পাছে, শীতকালের শিশিরের মত মাটিরবুকে ঝরিয়া পড়ে সেই ভয়েই বোধ হয় অতিকষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া, কোন মতে মুখ তুলিয়া বলিলেন "ইচ্ছা করে ত আর গাড়ী ফেল করিনি! এটা একটা দুর্ঘটনা বৈত নয়।"

মিঃ আয়েঙ্গারের হরিদ্রা প্রভ দন্তপংক্তি এবার কৌমুদী ছড়াইয়া বিকশিত হইল। ইস্পাত শাণে ঘষিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেই ধ্বনীর অনুকরণে তিনি বলিতে লাগিলেন "আমিত এর ভিতর কোনই বিপদ দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আপনার একজন আত্মীয় আপনার স্ত্রীকে কলিকাতা নিয়ে গেছেন,—সব গোল

কেটে গেছে। ট্রেন ফেল্ হওয়া — সে হল গিয়ে নিজের অসাবধানতার ফল। এর জন্য আপনাকে অশান্তি ভোগ করতেই হ'বে। একদিন পূর্ব্বে রওনা হলেইত ঠিক হত।"

এক জেদী স্বভাবের বশীভূত ও উথলিত ক্রোধাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া, গম্ভীর পরুষকণ্ঠে ননীবাবু বলিলেন "মাত্র আট দিনের ছুটী বইত নয়, রাস্তাই পাঁচটা দিন কেটে গেছে, — একদিন পূর্ব্বে রওনা হলে, কদিনই বা কলিকাতা থাকতুম ?"

মিঃ আয়াঙ্গার দৃঢ় স্বরে বলিলেন "এ অবস্থায় জরুরী কাজ ফেলে, ছুটীতে না গেলেই হত !"

কথায় ননীবাবুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। একমুহূর্ত্তে তাহার চোখে সংসারের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পায়ের নীচের মাটি যেন মুহূর্ত্তে দুলিয়া উঠিল। শেষে দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন "ভবিষ্যতে কি হবে তা ভেবে কাজ করতে গেলে সংসারে কোন কাজই হতে দেওয়া চলে না।"

মিঃ আয়াঙ্গার ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন "আমি

আপনার **Personal matter** এ মাথা ঘামাতে চাই না। আপনার যা বলার থাকে লিখে দিবেন এখন। আপনি এখন যেতে পারেন।" বলিয়া তিনি তীব্র দৃষ্টিতে ননীবাবুর প্রতি তাকাইলেন। তাঁহার অস্বাভাবিক রাঙ্গামুখে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চক্ষু-দুইটি যেন দুইটা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের মতই জ্বলিতে লাগিল।

ননীবাবু আর কোনই বাক্য ব্যয় না করিয়া স্বীয় আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার অন্তরের ভিতর একটা ভীষণ বিদ্রোহের ঝড়ের হাওয়া অবিরল বেগে বহিতে লাগিল। তাঁহার মুখে চিন্তা-ম্লান পাণ্ডু-রেখা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ছোট সাহেব মিঃ আয়ার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ননীবাবু! আপনাকে এরূপ দেখাচ্ছে কেন?"

ননীবাবু অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে সমস্ত বিবৃত করিয়া নিতান্ত অনড় ও নিশ্চলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মিঃ আয়ার একটুকু মুখ বিকৃত করিয়া সংযত

কণ্ঠে বলিলেন "আপনার বিপদের কথা শুনে খুবই দুঃখীত হলেম। দেখুন কলিকাতা হ'তে টেলিগ্রামের কি উত্তর আসে। একেই বলে গোলামী। কিছু করবার যো নেই,— মুখ বুজে সব সহ্য কত্তেই হবে। আপনারা ছেলে মানুষ কিনা — তাই এতটা Nervous হয়ে পড়ন। আরও কিছু দিন কাজ করলে, এসব সহ্য হয়ে যাবে।"

ননীবাবু রোষ-তীব্র দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বিরাগ পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "আমি আর চাকুরী করবো না বলে মনে স্থির করেছি। আজই চাকুরীর ইস্তাফা পত্র লিখে দোব।"

মিঃ আযার কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন "কথাটা পরুষ উচিতই বটে। তবে মনে রাখবেন আপনি বাঙ্গালী। চাকুরী আপনাদের মজ্জাগত। দুইশত টাকা বেতনের চাকুরীটা এত সহজে ছেড়ে দেওয়াটা, তাদের পক্ষে খুবই অসম্ভব।"

ননীবাবু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "কি করে এই সিদ্ধান্ত আপনি উপনীত হয়েছেন? পারি কি

না দেখে নিবেন এখন।"

মিঃ আয়ার স্মিত আস্যে বলিলেন "আমি কিছুদিন কলিকাতা ছিলুম, সেখানে অধিকাংশ বাঙ্গালীর অবস্থা দেখে, আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের ভিতর খুব বড় বড় চাকুরে রয়েছে সত্য, বুদ্ধি বৃত্তিতে আপনারা যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার উপযুক্ত তাও অস্বীকার কচ্ছি না, তবে আপনাদের অধিকাংশই যে ঐ চাকুরীর দিকে ঝুঁকে পড়ে, চাকুরীকেই অনায়াস লব্ধ অর্থ উপার্জ্জনের পথ ধরে নেয়, এটা অস্বীকার করা চলে না।"

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ননীবাবু গভীর দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন "কেন— তারা কি আর অন্য কোন কাজ কচ্ছে না?"

মিঃ আয়ার একটুকু হাসিয়া বলিলেন "তা কচ্ছে— কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম বলা যেতে পারে। এই কলিকাতার কথাই ভেবে দেখুন,

এই মহানগরীতে বিদেশীরা কি ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে ঘিরে বসে আছে। চিনা, মারওয়ারী, পাঞ্জাবী, ও অন্যান্য জাতি ব্যবসা বাণিজ্য করে কোটি কোটি টাকা বাঙ্গালা মুলুক হতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর বাঙ্গালীরা কেরাণীগিরিতেই সন্তুষ্ট হয়ে, দশটায় পাঁচটায়, কেহবা রাত্রি পর্য্যন্ত আফিস করে ঘরে ফিরছে। বেলা দশটায় ও সন্ধ্যা পাঁচটায় পীপিলিকার জাঙ্গালের মত রাস্তার দু'ধারে, সিগারেট মুখে গুঁজে, বিশুষ্ক মুখে ছুটে চলেছে — টেরী কাটা কেরাণী বাবুদের দল!"

ননীবাবু মিঃ আয়ারের কথায় মস্তক নত করিয়া শেষে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "গরিব দেশ,— মূলধন নেই বলে ঐ কেরাণীগিরিতেই ভর্ত্তি হতে বাধ্য হয়,— ব্যবসা কত্তে টাকা পয়সার দরকার।"

মিঃ আয়ার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "তা আমি স্বীকার কচ্ছি না। প্রথমতঃ বাঙ্গালীরা লক্ষ্য স্থির করে শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে না। পড়তে হবে — তাই পাশ করে যাচ্ছে। অনেকেই উকিল

হয়ে, শেষে সেই কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হয়ে থাকে, এর সার্থকতা কি ? যদি কেরাণীগিরিই কর্ত্তে হবে তবে ওকালতি না পড়ে অনেক সময় ও অর্থ অপ-ব্যয়ের হাত হতে মুক্ত কর্ত্তে পারে।"

ননীবাবু কথা শুনিয়া মুস্‌ড়িয়া পড়িলেন শেষে স্বর নামাইয়া বলিলেন "আমি এ-বিষয়ে এতদিন তলায়ে দেখ্‌তে চাই নি। দেখি চাকুরী ছেড়ে কি কর্ত্তে পারি।"

মিঃ আয়ার দৃঢ়স্বরে বলিলেন "দু'শত টাকার চাকুরী একেবারে ছেড়ে দিতে কিছুতেই উপদেশ দিচ্ছি না। আপনি ছুটী নিয়ে কিছুদিন চেষ্টা করে দেখুন, একটা সুবিধা করে উঠ্‌তে পার্‌লে, চাকুরী ছাড়াত নিজের হাতেই রয়েছে।"

ননীবাবু মিঃ আয়ারের প্রভাদীপ্ত অনৈসর্গিক মুখের দিকে অনিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া, তাঁহার প্রত্যেক কথা যে অনির্ব্বচনীয় সত্য, সুদৃঢ় ও অকাট্য তাহাই নীরবে জানিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে স্বীয় আসনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিথর হইয়া বসিয়া

রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর একটা ভীষণ বিদ্রোহের ঝড়ের হাওয়া অবিরল বেগে বহিতে লাগিল। তাঁহার চিত্ত গভীর ব্যথায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ননীবাবু চারিটার পর আফিস হইতে বাহির হইলেন এবং "দম" দেওয়া কলের পুতুলের মত সহরের রাস্তায় ঘুড়িয়া বেড়াইয়া, সন্ধ্যার পর যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন তাঁহার শরীর অবসাদে ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি ইজিচেয়ারে উপবেশন করিয়া মুদ্রিত নেত্রে নানা চিন্তায় আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ননীবাবু রাত্রি আটটায় সান্ধ্য ভোজন সমাধা করিয়া ফেলিলেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া ক্ষুদ্র কামরায় একধারে আরাম কেদারায় লম্বমান হইয়া, পরস্পর বিরোধী নানা চিন্তায় আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলি-

লেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইতেছিল না, মন যেন ক্রমাগতই অনিশ্চিত অমঙ্গলের প্রত্যাশায় শঙ্কিত হইতে লাগিল।

মিঃ আয়াঙ্গারের নিষ্ঠুর ব্যবহার, স্বার্থপর গর্ব্বান্ধ উক্তির প্রতিবর্ণ ননীবাবুর মনের ভিতর স্বপ্ন জালের মত একটা বিফলতার সৃষ্টি করিয়া দিল। সেই দীর্ণ-স্মৃতি যেন ননীবাবুর অন্তরের প্রতি পরদার ভিতর অসীম পরিবর্ত্তনের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া, কলঙ্ক মূলক সমালোচনার অস্পষ্ট ছায়া জাগাইয়া তুলিল।

অনভ্যস্থ, অসহনীয় দাসত্ব বন্ধনের চরম পরিণাম চিন্তা করিয়া ননীবাবু একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। চাকুরীর মোহজাল হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া, স্বাস্তির নিশ্বাস ছাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্যনীয় বিপদের পরিবেষ্টনের মধ্যে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের একটা চিত্র জাগাইয়া তুলিয়া, চোখের জলের বাঁধ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। পদনখ হইতে কেশমূল পর্য্যন্ত অশান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া সমস্ত

ললাটে, মুখমণ্ডলে, হিমশুভ্র আভা ফুটাইয়া তুলিল।

আশঙ্কা জড়িত, দুশ্চিন্তা প্রপীড়িত, ক্লেশক্লিষ্ট শরীর মন লইয়া ননীবাবু আরও পাঁচটা দিন কাটাইয়া দিলেন। কলিকাতা হইতে চিঠি আসা দূরের কথা, টেলিগ্রামের উত্তর পর্য্যন্ত হস্তগত হইল না।

বেলা নয়টা বাজিয়া ছিল! ননীবাবু চা পান শেষ করিয়া ডাকের চিঠির প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। কয়েক মিনিট অতিবাহিত না হইতেই চাকর ডাকের কয়েকখানা চিঠি ও খবরের কাগজ টেবিলের উপর সংরক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল।

ননীবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত চিঠি কয়-খানির শিরোনামা পড়িতে লাগিলেন। শেষে কলি-কাতার কোনই চিঠি দেখিতে না পাইয়া, বিমর্ষভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া রহিলেন, অসীম হতাশে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া ননীবাবু "ইংলিশম্যান" খবরের কাগজ-খানার কভারিং খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন! মন-সংযোগের অভাবে কাগজখানা ভালরূপ পড়িতে

পারিলেন না। কয়েক মিনিট সমস্ত সংবাদের 'হেডিং' গুলি পাঠ করিয়া, কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। ঠিক সেই সময় কাগজের এক স্থানে বড় "টাইপে" লিখিত **"Sad accident"** এর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তিনি নিতান্ত আগ্রহের সহিত এক নিঃশ্বাসে সংবাদটি পড়িয়া ফেলিলেন, সংবাদের সার মর্ম্ম এই—

"কলিকাতা নিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জব্বলপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিলেন। **Chhatisgarh** ষ্টেসনে রেলের লাইন পাড় হইবার সময়, তাঁহার সঙ্গীয় একটি ভদ্র মহিলা, দৈবাৎ রেলের লাইনে হুচট্ খাইয়া পড়িয়া, "মেল" ট্রেনের চাকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অসাবধানতাই এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ। মৃতদেহ কলিকাতা নীত হইয়াছিল। মৃতা খ্যাতনামা এটর্নি রমেশবাবুর আত্মিয়া।"

সংবাদ পড়িয়া ননীবাবুর হস্ত কাঁপিতে

লাগিল। সমস্ত শক্তি যেন শরীর হইতে অপসৃত হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত জড়পিণ্ড পরিণত করিল। তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। একটা ভৌতিক ব্যাপারের ছায়ার মত তাঁহার চিত্তকে অনুসরণ করিতে লাগিল। তাঁহার চোখের কোণে যেন গঙ্গোত্তরীর প্রবল জল স্রোতের মত অশ্রুধারা তর্‌ তর্‌ বেগে ছুটিতে লাগিল।

ননীবাবু টেবিলের উপর মস্তক সংরক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "সঙ্গীয় স্ত্রীলোক ঊষা বলেই মনে হচ্ছে, রমেশবাবুর আত্মিয়া যে ঊষাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এতে সন্দেহ করার আর কি রয়েছে ? এ ঊষাই— কোন সন্দেহ করার নেই এতে। যদি আর কেউ হত, তবে কলিকাতা হ'তে তারের উত্তর নিশ্চয় পেতুম। ঊষা নেই,-- তাঁরা আর তারের উত্তর দিতে যাবে কেন ? আমি এখন তাঁদের কে ? এখন আর কি সম্বন্ধ তাদের সাথে ?

ননীবাবু বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়নের সম্মুখে যেন ঊষার

দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু নিমেষে ফুটিয়া উঠিল। জলভারা-ক্রান্ত শ্রাবণাকাশের ঘন মেঘের মতই শেষে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ননীবাবু ভাবিতে লাগিলেন শৈশবের পিতৃমাতৃ বিয়োগের কথা, আশ্রয়দাতা হরি-নারায়ণবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর কথা, আর শেষ বন্ধন সেই উষা, সেই উষাও যে আমাকে ছেড়ে চলে গেল? উষা যে আমার সকলের চেয়ে প্রিয়তম ছিল, সে যে আমার অন্তরাসনের চির প্রতিষ্ঠিতা দেবী। এত গুণ, এত রূপ, এত স্নেহ, আমি আর কোথায় পাইব? উষা যে আজ সংসার হ'তে অনেক দূরে চলে গেছে! এ-জীবনে কোন দিনই তার নিকট পৌঁছতে পারব না! এরূপ জ্বালাভরা চিত্তে এলো-মেলোভাবে কত কথাই ননীবাবুর অন্তরে উঠা নামা করিতে লাগিল। ননীবাবু ব্যথা-বিকল-চিত্তে বারেন্দায় পদচারণ করিতে লাগিলেন, একটা অসহনীয় জ্বালায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল।

ইহার পর দুটি ঘণ্টা অতিবাহিত না হইতেই টেলিগ্রাম মেসেঞ্জার একখানা টেলিগ্রাম আনিয়া

ননীবাবুর হস্তে প্রদান করিল। ননীবাবু রসীদখানা সহি করিয়া তাহার নিকট প্রত্যার্পণ করিলেন এবং এক নিঃশ্বাসে টেলিগ্রামখানা পড়িয়া ফেলিলেন। উহাতে লিখা ছিল **"Sad accident, come if possible, condole bereaved family."**

সেই যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ সংবাদ পাঠ করিয়া ননীবাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল। উমার মৃত্যুর বিষয় আর কোন সংশয়ই তাহার অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারিল না। তাহার চক্ষুদ্বয় ক্ষীণ, অশ্রু ভারাক্রান্ত এবং মুখখানি অস্বাভাবিক মানসিক বেদনা গোপন চেষ্টায় রক্তিম হইয়া উঠিল। উমার উজ্জ্বল বিস্তৃত চক্ষু দুইটি এবং হাস্য রেখা চিত্রিত ফুল্ল ওষ্ঠাধর যেন জীবন্ত মূর্ত্তিতেই তাহার স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠিল। ননীবাবু প্রায় আর্ত্তনাদের মতই যন্ত্রণা ব্যঞ্জক ধ্বনী করিতে করিতে সংজ্ঞা হারাইয়া চেয়ার হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া ননীবাবু সমস্তদিন কাটাইয়া দিলেন। প্রকৃত ঘটনা সঠিক অবগত হইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কলিকাতা চিঠি লিখিতে বসিলেন, কয়েকখানা চিঠির কাগজ নষ্ট করিয়া শেষে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কোন লিখাই মনঃপূত হইল না। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল নীহার দিদির শেষ কথাগুলি, আর উষার সেই কাতরতাপূর্ণ শেষ অনুরোধের কথা। তৎসঙ্গে ননীবাবুর বুকের ভিতর অপরাধীর ন্যায় একটা ধিক্কারের ঝড় তোলপাড় করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন--হায়! কত বড় ছেলেমানুষী দুর্ব্বলতাই না প্রকাশ করিয়াছি! কত বড় অন্যায় অনুষ্ঠানের বীজ আমার শরীরে নিহিত রয়েছে!

আমার একগুঁয়েমিতেই না এতবড় একটা বিপদ হয়ে গেল,— এর জন্য আমিই ত প্রকৃত পক্ষে দায়ী! এখন কা'র নিকট চিঠি দিব? তা'রা এখন আমার কে? আমিই বা তাদের এখন কে? আমার সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, এখন আমিই যে আমার একমাত্র সম্বল! না,—আর চিঠি লিখে কি হ'বে!

সামান্য আহারীয় গলধঃকরণ করিয়া ননীবাবু রাত্রি নয়টায় যাইয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। নিদ্রা আসিল না। উনার প্রতিকথা স্মৃতিপথে জাগরিত হইতে লাগিল। অতীত যৌবন লীলার প্রতি অঙ্ক বায়স্কোপের দ্রুত ধাবমান চিত্রের মতই, একটার পর আর একটা যেন তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। প্রতি অঙ্কের ছায়াগুলি যেন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া, শরীরের শিরা উপশিরাগুলির ভিতর অসীম মাদকতার সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সম্মুখে উন্মুক্ত গবাক্ষ, তাহারি ভিতর দিয়া তরুকুঞ্জে শুক্লা সপ্তমী'র চাঁদ, সুধার ধারা ছড়াইয়া

হাসিতেছিল। আঙিনার বাহিরে রাজপথ তখন জনশূন্য ও শকট শূন্য। তাহার উভয় পার্শ্বের বিটপীশ্রেণী মৃদু বাতাসে সর সর শব্দে কাঁপিতে ছিল। অদূরে শ্যামল বৃক্ষরাজির ঘন পল্লব ছায়ার পার্শ্বে সহস্র জোনাকির নর্তন, গৃহস্থ গৃহের ক্ষুদ্র সান্ধ্যদীপের মতই ফুটিতেছিল। চারিদিকে যেন প্রকৃতির অনিন্দ্য একটানা সৌন্দর্যোর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে! সুন্দর রাত্রি, চাঁদের হাসি, তারকার ছুটাছুটি, সকলই যেন শোভা হারাইয়া ননীবাবুর চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

ননীবাবুর চোখের সম্মুখে উমার অপরূপ ছায়া যেন ভাসিয়া উঠিল, সেই চোখ টিপিয়া হাসা, অভিমান ভরে পিছন ফিরিয়া তাকান, সেই বাতাসে উড়া আঁচল, সেই বাতাসে দোলা চুল আর সেই মধুর আকুল করা সুর, সমস্তই যেন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উমা যে এত সুন্দর, এত মধুর, এত আপন ছিল, তা'ত ননীবাবু এতদিন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। এতদিন যে সম্বন্ধ স্মৃতির ভিতর আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, বিচ্ছেদের রেখা পাতে আজ সেই

প্রতিমা যেন মুহূর্ত্তে প্রাণময় হইয়া উঠিল। অভাব তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে অসীম সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়া, ঊষার সকল কার্য্যগুলি নিখুঁত চিত্রে পরিণত হইল, এবং ননীবাবুর চক্ষুর সম্মুখে এক নিমেষে যেন অভিনবভাবে ফুটিয়া উঠিল।

ননীবাবু উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন—ঊষা! এত নির্দ্দয় কেন হলে? আমি যে প্রাণ দিয়ে তোমাকেই চাই, যুগে যুগে এমনি ভাবে হয়ত চেয়েছি, দুঃখের তীব্রতম হলাহল, এতদিন তোমাকে পেয়েই যে ভুলে ছিলুম, তোমাকে হারাবার মত এত বড় অভিসম্পাত, এতবড় নিস্ফলতা জীবনে আর কখনও যে অনুভব করি নি। তুমি ছিলে সুন্দর, সুধু রূপে তা যে নয়! গুণেও তুমি ছিলে বিস্ময়ের রশ্মী, প্রীতির জ্যোৎস্নাধার! তোমার সেই মধুর স্বর যে ভুলতে পারি না। কাণে, প্রাণে, আকাশে, বাতাসে সে স্বর যেন বেঁজে আমাকে পাগল করে তুলছে! তোমাকে ভুলতে হবে? তোমার স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে? তার যে উপায় নেই আমার, সে কথা ভাব-

তেও যে শরীর শিহরে উঠে! তোমার সেই রূপ ছাপিয়ে উঠে আমাকে যে মতিভ্রম করে দেয়!

কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক ও বিমূঢ়বৎ শায়িত থাকিয়া একটা বুক ফাটা হাঁহাঁকারের মতই আর্ত্তস্বরে ননীবাবু বলিলেন। ঊষা! পরক্ষণে আবার আপন মনে বলিতে লাগিলেন—ঊষা! তোমাকে যে ভুলা যায় না। তোমার ঐ শান্ত স্নিগ্ধ সরলতা, আমাকে যেন এক অভিনব আনন্দে অভিষিক্ত করেছিল। তোমার অনাবিল সঙ্গ, স্নেহমাখা স্পর্শ যেন বিমল ঊষালোকের মতই আমাকে প্রদীপ্ত ও পবিত্র করে দিয়েছিল। যে দিন হাসি মুখে আমার গলে বরমাল্য পড়িয়েছিলে, সেদিন আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করে ছিলুম। আমার জীবন ধন্য হল মনে করেছিলুম। জগতের যা কিছু ভাল, যা কিছু বাঞ্ছিত, যা কিছু পবিত্র, মূর্ত্তিমতী ছায়ার মতই সেদিন আমার অন্তরে প্রবেশ করেছিল। আর আজ সেই বিসর্জ্জনের ঢাকের শব্দ যেন আমার বুকে শত বৃশ্চিক দংশন কর্ত্তে চাচ্ছে! তুমি নেই, তা যে ভাবতেই ইচ্ছা হচ্ছে

না, আজ আমাদের ভিতর যে দুরত্বের সৃষ্টি হয়েছে, তার ভিতর অন্তরের সমস্ত সুপ্ততৃষ্ণা জাগ্রত হয়ে, আমার অন্তরের সমস্ত চিন্তা বেষ্টন করে, সেই মহা-মিলনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে! জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যে আকর্ষণটা তোমার ভিতর প্রবল হয়ে, আমাকে দূরে ফেলে দিয়েছে, আমি সেটাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে দিয়ে আজ আমাদের অসীম ব্যবধান দূর করিতে চাইছি, সেই মহামিলনের শুভক্ষণ যে কত দূরে তা'ত ঠিক বুঝে উঠ্তে পাচ্ছি না!

ননীবাবু পাগলের ন্যায় বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া, বারেন্দার এক পার্শ্বে, মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ননীবাবু বিষম অশান্তি ও উদ্বেগের কষাঘাত সহ্য করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। রাত্রিতে চোখের দুই পাতা একত্র করিতে পারিলেন না। যত-ক্ষণ শয়ন করিলেন, বিছানা যেন কাটার মত অনুভব করিলেন। ভোরে একটুকুন ফর্শা হইতেই, ঘরের ভিতর পা চারি করিয়া বেড়াইলেন। ক্রমে সাতটা

বাজিল। ননীবাবু নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করা যায়, এই অবস্থায় চাকুরী করাই অসাধ্য! কলিকাতা যাওয়া যাক্, সঠিক খবর জানা যাবে এখন। পাগল আমি! সঠিক খবর আর কি জান্তে বাকী রয়েছে--? ঊষা নেই, সব শেষ হয়ে গেছে, সেই কোমল দেহ, ছাই হয়ে গেছে, শ্মশান মৃত্তিকায় মিশে গেছে! কলিকাতা গিয়ে কি হ'বে? শুধু ঠাট্টা বিদ্রূপ শুন্তে যাব, এগুলি সহ্য করা সম্ভবপর হবে? তবে কোথা যাই, আমার কে আছে যে আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারে? এখানে একা পড়ে থাক্লে আমি যে পাগল হয়ে যাব? না কোথায় যেতেই হবে, কোথায় যাই? ওয়ালটায়ার গেলে হয় না? শুনেছি্ স্থানটি নির্জ্জন, সেখানে বাঙ্গালা মুলুকের লোক খুব কমই আছে, কেউ আমাকে চিন্তে পারবে না, অজ্ঞাতবাস, মন্দ হবে না।"

ননীবাবু অতঃপর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইলেন। বেলা নয়টায় সিভিল সার্জ্জন মিঃ ব্ল্যাকি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তিন মাসের

ছুটীর জন্য সার্টিফিকেট চাহিলেন।

সাহেব ননীবাবুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিবেন "I see you are in perfect health. How can it be possible for me to grant you a false certificate ?"

ননীবাবু গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন "I lost my wife very recently, I am mentaly unfit to push on work."

সাহেব সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিলেন "Is it Baboo !"

ননীবাবু কোনই প্রত্যুত্তর না করিয়া ষোলটি রৌপ্য মুদ্রা টেবিলের উপর সংরক্ষণ করিলেন, এবং আগ্রহ দৃষ্টিতে সাহেবের বিস্ময়াপন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন "I am mistaken Baboo. I see you are really ill, come up, let me examine."

সাহেব stethoscope লইয়া ননীবাবুর বুক

পরীক্ষা করিয়া তীব্র স্বরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন **"Heărt desease, palpitation of the action of the heart, palpitation from emotional causes. You require perfect rest for at least three months, no doubt.**

অতঃপর টাকা কয়টি পকেটে রাখিয়া সাহেব সার্টিফিকেট লিখিয়া ফেলিলেন এবং হাত বাড়াইয়া ননীবাবুর হস্তে অর্পণ করিলেন। ননীবাবু সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

ডাক্তারের সর্টিফিকেট সহ ছুটীর দরখাস্ত যে দিন মিঃ আয়াঙ্গারের হস্তগত হইল, সে দিনই তিনি আফিসের দ্বিতীয় কেরাণী মিঃ চতুর্ভুজের দ্বারা ননী-বাবুকে অবসর করিয়া দিলেন। এই চতুর্ভুজকে ঐ পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিবার জন্য মিঃ আয়াঙ্গার কয়েক মাস যাবত চেষ্টা করিতে ছিলেন। ননীবাবুর উপর রূঢ় ব্যবহারও ইহার অন্যতম কারণ। এই সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত

হইয়াছিলেন এবং ভাবাতিশয্যে ননীবাবুকে আরও বেশী দিনের ছুটী লইয়া শরীর মন সুস্থ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন।

ননীবাবু আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ সঙ্গে করিয়া, পরদিন বেলা দুইটার গাড়ীতে ওয়ালটায়ার যাত্রা করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—0—

বেলা আটটায় মেল-ট্রেন খোরদা-রোডে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের অত্যন্ত ভিড়। পুরী যাত্রীদের হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকিতে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইতেছিল। ননীবাবু গাড়ীর গবাক্ষপথে মস্তক বাহির করিয়া, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ফাল্গুন মাস। বসন্তের আগমন বার্ত্তা জানাই-বার জন্য প্রকৃতিদেবী নানা সাজ সজ্জা করিয়া, চঞ্চল বাতাসে কুসুম সৌরভ ভরপুর করিয়া, একটা নূতন পুলকের সাড়া আনিতেছিল। রাত্রিতে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল। কয়েক মাস অনাবৃষ্টির পর বারিসিক্ত ধরণীর গাত্র হইতে একটা গন্ধ উত্থিত হইয়া, চারিদিকে ছড়াছড়ি করিতেছিল। ষ্টেসনের বাহিরে ক্ষুদ্র ডোবার জলে নামিয়া, দরিদ্র পল্লী রমণিগণ সাগ্রহে জলজ শাক সংগ্রহ করিতেছিল। অদূরে আম্র মুকুল, সৌগন্ধা-লুব্ধ ভ্রমরকুল আম্র শাখা সমীপে ঘন গুঞ্জন ধ্বনী করিতেছিল, সমীরণ ডোবার সুশীতল সলীলাভিষিক্ত হইয়া চঞ্চল চরণে তাহার উপয় নাচিয়া বেড়াইতেছিল। ষ্টেসনের বেড়ার উপর মাধবী লতার শুভ্র কুসুমগুলি মৃদুবায়ু আন্দোলনে এদিক ওদিক দুলিতেছিল। পার্শ্বে একটা বিলাতি পুষ্পবৃক্ষ হইতে সুতীব্র গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর নিকটে একদল উড়িয়া

পাণ্ডা চকিত নয়নে যাত্রীর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। একজন উড়িয়া ভিক্ষুক, মুণ্ডিত মস্তকের উপরিভাগস্থ সযত্ন রক্ষিত কেশগুচ্ছ দুলাইয়া গাহিতেছিল।

প্রাণ পতি করি এই মিনতি,
জীবন রামকে বনে দিওনা—এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা
জীবন রামকে বনে দিলে,
জীবনের জীবন রবে না—এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা,
জীবন রামকে সঙ্গে করে,
খাব আমি ভিক্ষা করে, নগর দ্বারে,
ভরতেরে দিয়ে রাজ্য,
পুড়াব মনের বাসনা—এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা !

অদূরে কয়েকজন পাণ্ডা-ঠাকুর গানের ভাবে বিভোর হইয়া মুদ্রিত নেত্রে মাথা নাড়িতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন চর্ব্বিত তাম্বুলাংশ গালের ভিতর উঁই ঢিপীর মত স্তুপের সৃষ্টি করিয়া, রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় ফুলাইয়া, বলিয়া উঠিল "বাবা! জগন্নাথ! কমর রোচন! মোর দুরভাগ্য তোমার রীরা কি

বুঝিব মুই ?

ঠিক এমনি সময়ে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ননীবাবুর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন এ গাড়ীতেই উঠা যাক্, "জনানা" গাড়ীতে কাউকে আর উঠে কাজ নেই। অতঃপর ভদ্রলোকটি স্ত্রী ও কন্যাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, কুলীর সাহায্যে সঙ্গীয় জিনিষগুলি গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। স্ত্রী ও কন্যাকে এক বেঞ্চে বসাইয়া, স্বয়ং ননীবাবুর পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। ননীবাবু ধীরে ধীরে একটুকু সরিয়া, আগন্তুকের বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল, গার্ডের নিশান উড়িল, ট্রেন আবার সচল হইয়া মাটি কাঁপাইয়া ছুটিয়া চলিল।

ভদ্রলোকটির নাম অসিতচন্দ্র রায়। চব্বিশ-পরগণার কোন পল্লীগ্রামে বাড়ী। বয়স ষাট বৎসর। স্বাস্থ্য সুন্দর, কান্তিময় দেহ,বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। ইনি ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিলেন। দুই বৎসর হইল পেন্স্যান লইয়া দেশ পর্য্যটনে মনোযোগী হইয়াছেন।

কন্যা শুভার বয়স সতর বৎসর! ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই, এ পড়িতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা ও মসৃণতা যেন তপ্ত কাঞ্চন সম উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। চির চঞ্চল নেত্রযুগল যেন সরম সঙ্কোচে নত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার অঙ্গের প্রতিস্তরে যৌবন-রসে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছিল। মোহিনী প্রকৃতির বুকের মদির-গন্ধ, সপ্ত বর্ণের ছায়া, ওড়নার ফাঁকে যেন মত্ততায় ভাসিয়া আসিতেছিল। ষড় ঋতুর পূর্ণ সম্ভারের বরণ-ডালা সাজাইয়া যেন বিকশিত ফুলের মতই দেখাইতেছিল। তাহার দেহ, যেন লজ্জা বিজড়িত সচল চাহনিটুকু লইয়া, সহস্র কমলমূর্ত্তির শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শুভার বিবাহ হয় নাই, চেষ্টা চলিতেছিল।

অসিতবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, ননীবাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন "আপনি কোথায় যাবেন?"

ননীবাবু ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "আজ্ঞে

ওয়ালটায়ারে যাব।"

"আপনি কোথা হ'তে আসছেন? ওয়ালটায়ারেই থাকেন বোধ হয়!"

আঁজ্ঞে তা নয়, আমি নাগপুর হ'তে আসছি ওখানে **change** এ যাচ্ছি কয়েক মাস সেখানে থাকব বলে মনে কচ্ছি।"

"তা বেশ নাগপুর কি করেন।"

"একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসে কাজ করি।"

অসিতবাবু ননীবাবুর প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত চকিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন "আমারও একজন আত্মীয় কলিকাতা একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসে কাজ কচ্ছে। আপনাদের যেরূপ খাটুনী তা'তে মাঝে মাঝে বিশ্রামের খুবই দরকার। আমার আত্মীয়ের নিকট শুনেছি তাদের নাকি নয় দশ ঘণ্টা কাজ কত্তে হয়। এত কাজে ভুল চুক হলে, কৈফৎ দিতেই হাঁপিয়ে পড়তে হয়।"

ননীবাবু স্মিত মুখে উত্তর করিলেন "অনেকটা

তাই, অনেক লেখা পড়া করা গেছে, কোনই প্রতিকার হয় নি।”

“লেগে থাক্‌তে হবে, সহজে কেউ কি কিছু দিতে চায়? এর জন্য দায়ী ত আমরাই, সব তাতেই রাজী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একটা কাজ খালী হলে, ডজনে ডজনে বি,এ, এম, এর ছড়াছড়ি! কমে চালাতে পার্‌লে লোক বাড়াতে কে চায়? যাক্‌ সে কথা, আপনি ওয়ালটায়ার কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন?

ননীবাবু স্মিত হাস্যে বলিলেন “ভাইজাকে **Turners choultry** নামক পান্থশালায় আপাততঃ উঠ্‌ব। পরে বাসা ভাড়া করে নিব মনে করেছি।”

অসিতবাবু দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন “আমরাও **Piraj mansions** নামক বাড়ীতে চারিটা ঘর ভাড়া করেছি। এই স্থানটি সমুদ্রের ধারে। আমি আরও একবার ওখানে গিয়েছিলুম। ওয়ালটায়ার উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমির উপর এবং ভিজাগাপটাম নিম্ন ভূমির উপর অবস্থিত। সমুদ্রের কিনারা হ'তে

একটা রাস্তা ওয়ালটায়ারের উচ্চভূমির দিকে চলে গেছে। উহার উপর হ'তে সমুদ্রটা একখণ্ড নীল কাচের ন্যায় দেখায়। ওয়ালটায়ারের পশ্চিম প্রান্তে নদীর ধারে, তিনটি ক্ষুদ্র পাহাড় রয়েছে। একটি পাহাড়ের নাম **Ross Hill** উহাতে একটা গির্জ্জা রয়েছে। অপর দুইটিতে মসজিদ ও হিন্দু মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। স্থানটি খুবই মনোরম।"

অতঃপর অসিতবাবু বহুক্ষণ আলাপ করিয়া ননীবাবুর সমস্ত পরিচয় ও স্ত্রী বিয়োগের কাহিনী অবগত হইলেন। অসিতবাবু সমস্ত শুনিয়া সহানুভূতি সূচক স্বরে বলিলেন "খুবই শোচনীয় মৃত্যু সন্দেহ নাই। তা চিন্তা করে ফল নেই। সবকেই মরতে হবে, শোক করে ফিরে পাওয়ার যো নেই। আমিও পাঁচটি সন্তান হারিয়ে, একটি মাত্র কন্যা নিয়ে ঘরকান্না কচ্ছি। সকলই ভগবানের হাত।"

অসিতবাবুর সহানুভূতি সূচক কথায় ননীবাবুর চক্ষে জল আসিল। ননীবাবু রুমালে চক্ষু মুছিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন। বাহিরে দুই

পার্শ্বে অবিচ্ছিন্ন পর্বত মালার উচ্চ শিখর দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল। কোথায়ও পাহাড়ের সমতল ভূমির উপর খণ্ড খণ্ড কাল পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। কোথায়ও গভীর খাদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মলতায় সমাচ্ছন্ন। ননীবাবুর দৃষ্টি উদাস। এ সমস্ত সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইতে পারিতেছিল না।

অসিতবাবু ননীবাবুর মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন "ননি! তোমার কোন আপত্তি না থাকলে, আমার বাসায়ই থাকতে পারবে। কোন কষ্টই হবে না। ঠাকুর চাকরও আমার সঙ্গে রয়েছে। এ অবস্থায় একা থাকলে মানসিক অশান্তি আরো বেড়ে উঠবে। কোন লজ্জা করবার নেই এতে।"

ননীবাবুর সমস্ত শরীর মন এই পরামর্শে বারুদ ঠেসা তুবড়ীর মতই মুহূর্ত্তে উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। ননীবাবু প্রকাশ্যে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। নীরবে মাথা নীচু করিয়া

বসিয়া রহিলেন।

গাড়ী যখন গন্তব্যে পৌঁছিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছিল। অসিতবাবুর গৃহিণী হরসুন্দরী "টিফিন বাক্স" হইতে, জলখাবার ও কিছু ফল দুই খানা প্লেটে সাজাইয়া, শুভাকে পরিবেশন করিতে আদেশ করিলেন। শুভা ননীবাবুর প্রতি কয়েকবার তাকাইয়া আড়ষ্ট অভিভূতবৎ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার গণ্ডস্থল যেন মুহূর্তে ডালিম-ফুলের মত রক্তিমাভা ধারণ করিল। শুভা মাথা নীচু করিয়া স্বীয় অঞ্চল হইতে রেশমী সূত্র টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

ননীবাবু সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই তরুণীর নবারুণোদ্ভাসিত অনিন্দিত মুখের দিকে একবার তাকাইয়া, বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তিনি যেন তন্ময় হইয়া বাহিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছেন এমনিই ভাব দেখাইলেন।

অসিতবাবু শুভার অতর্কিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "লজ্জা কি মা! খাবার দিয়ে যাও।

নদী বাঙ্গালা দেশের লোক। ঘরের ছেলের মতই এ যে।” বলিয়া অসিতবাবু শুভার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন।

শুভা মস্তক উত্তোলন করিয়া অসিতবাবুর প্রতি তাকাইল। শেষে প্লেট দুইখানা একে একে উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া স্বীয় আসনে যাইয়া উপবেশন করিল। কোন কথাই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তাহার অন্তর যেন অজ্ঞাতে একটা বিপুল আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। শুভা অন্তরের চঞ্চলতা সামালাইয়া লইবার উদ্দেশে, মাসিক পত্রিকা খানা টানিয়া লইয়া, একটি প্রবন্ধ পাঠে মনঃসংযোগ করিল।

রাত্রি নয়টায় গাড়ী ওয়ালটায়ায় ষ্টেসনে যাইয়া দাঁড়াইল। অসিতবাবু সকলকে লইয়া খান্তিতে * চড়িয়া **Piroj mansions** এর দিকে যাত্রা করিলেন।

---

* খান্তি একরকম গরুর গাড়ী। ঘোড়ার গাড়ী হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট। খান্তির পশ্চাৎ ভাগে মাত্র একটা দরজা থাকে—লেখক।

নবম পরিচ্ছেদ।

—0—

ননী বাবু Piraj mansions এ অসিত বাবুর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঊষার অতীত স্মৃতিগুলি বুকের ভিতর স্তরে স্তরে সাজাইয়া, সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহর কাটাইয়া দিতেন। সময় সময় বিশ্রাম হীন ভূতগ্রস্তের মত, উন্মনা চিত্তে উদ্দেশ্যহীন ভাবে, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সকাল, সন্ধ্যায় সাগরের শ্যামল শোভা, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের দৃশ্য দেখিতেন। সীমাচলের পাহাড়ে হনুমন্ত—বঙ্ক নামক ক্ষুদ্র নদীর কলধ্বনী শ্রবন করিতেন। সময়ে সময়ে সীমাচলের তোরণ দ্বারের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাধারা নামক নির্ঝরের পার্শ্বে উপবেশন করিতেন। তাহার কল্ কল্ শব্দ-সঙ্গীত, মলয়ের সুরভি নিশ্বাসের মতই ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত।

এ-কি সঙ্গীত—এ-কি প্রাণ মাতানো কলধ্বনী!

ননীবাবুর সমস্ত তৃষিত চিত্ত, সেই নির্জ্জন রাজ্যের স্বপ্ন লহরীবৎ, ললিত তান পান করিবার জন্য অধীর উন্মত্ত ও অশান্ত হইয়া উঠিত।

অসিতবাবুর বাসায় ননীবাবুর কোনই অসুবিধা ছিল না। অসিতবাবু ও তাঁহার গৃহিনী হরসুন্দরী ননীবাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গৃহিনী স্বীয় পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে যত্ন করিতেন। বাসার ঠাকুর চাকর তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য যেন এক পায় খাড়া থাকিত।

ননীবাবুর শয়ন কক্ষটি সর্ব্বদাই আবশ্যকীয় জিনিষে সুসজ্জিত থাকিত। কে যেন ননীবাবুর অজ্ঞাতসারে তাহার সমস্ত জিনিষগুলি সুশৃঙ্খলতার সহিত সাজাইয়া রাখিত। প্রত্যহ সান্ধ্য-ভ্রমণের পর, কক্ষটিতে ঢুকিতেই, সুগন্ধে ননীবাবুর মন ভরপুর হইয়া যাইত। বিছানায় হরেক রকমের টাট্‌কা ফুলের মালা, কত ফোঁটা ফুলের ছড়াছড়ি, কক্ষটি যেন সৌরভে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। কখনও বিলাতি ক্রটনে তৈয়ারি তোড়া, বহু ফুলে সজ্জিত

হইয়া, টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করিত।

ননীবাবু সর্ব্বদাই ভাবিতেন—এ সব কে করে? তা'র জন্য কার এত মাথা ব্যথা? তা'কে যত্ন করার এমন কে আছে? তা'র তৃপ্তির জন্য এমনি ভাবে, কে নিয়োজিত রয়েছে? প্রত্যহ আড়াল হ'তে, একই নিয়মে, কর্ত্তব্য কার্য্যের মত, সকল কাজ নিপুণতার সহিত সমাধা করে, তৃপ্তি অনুভব করবার মত তা'র কে আছে? কোন কাজেই খুঁত নেই, কোন কাজই অসম্পূর্ণ থাকে না। যেন চিরাভ্যস্থ, শিখান দৈনন্দিন কার্য্যগুলি একই নিয়মে সে সম্পন্ন করে যাচ্ছে!

ননীবাবুর অন্তর আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই অজ্ঞাত কর্ম্মীর সন্ধান করিবার জন্য ননীবাবু আজ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্য দিনের ন্যায় ননীবাবু আজ বেড়াইতে বাহির হইলেন না। চা পান শেষ করিয়া, স্বীয় কক্ষের এক কোণে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে সাড়ে পাঁচটা বাজিল। পশ্চিম গগন

হইতে শ্রান্ত--তপনের লোহিত রশ্মিজাল তখনও অপসৃত হয় নাই। বিশাল সমুদ্রবক্ষ ও তীরস্থ ঝাউ, দেবদারু বৃক্ষগুলি তখনও সেই বিদায় কালীন তপ-নের স্নিগ্ধকর চুম্বনে দীপ্তি পাইতেছিল। ঠিক সেই সময় শুভা ধীর পদক্ষেপে, সসঙ্কোচে, একটি ফুলের মালা ও কিছু তাজা ফুল হস্তে করিয়া, ননীবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিল। ফুলের মালাটি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া, শয্যার দিকে অগ্রসর হইতেই শুভার দৃষ্টি ননীবাবুর প্রতি নিবদ্ধ হইল। শুভা ননীবাবুকে সম্মুখে দেখিয়া, একেবারে আড়ষ্ট অভিভূতবৎ হইয়া পড়িল। তাহার অধরের স্নিগ্ধ স্মিত হাস্য, মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেলেও, মুখে সুকোমল দীপ্তি বিভাসিত হইতে লাগিল।

শুভা একবার ননীবাবুর চোখেরদিকে তাকাইয়াই শত অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিল। লজ্জা ও ভয়ে কাতর পাণ্ডুবর্ণ ছবি, শুভার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহার অসীম শক্তি ও তেজ পূর্ণ মুখ, মুহূর্ত্তে কি এক শঙ্কায় কাতর ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ডদেশ "বসরা" গোলাপের বর্ণ ধারণ করিল।

ননীবাবু আহত-বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া, অপলক নেত্রে শুভার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শুভার ভাষাহীন ও ভাবোন্মাদক দৃষ্টি ননীবাবুকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। ক্রমে ননীবাবুর দৃষ্টি যেন পৃথিবীর অজ্ঞাত পরপারে ভাসিয়া চলিয়া গেল, সেই দৃষ্টি যেন বড়ই মর্ম্মাহত ও বিপর্য্যস্ত!

কয়েক মুহূর্ত্ত স্বপ্নাভিভূতবৎ নীরবে থাকিয়া ননীবাবু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "আপনি রোজই আমার জন্য ফুল রেখে যান, টেবিল, বিছানা সাজিয়ে রেখে যান, —নয় কি?"

সহসা সকল লজ্জার বাঁধ অন্তরাল করিয়া দিয়া, শুভা সতৃষ্ণ নয়নে ননীবাবুর মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল "হ্যাঁ"। পরক্ষণেই তাহার চকিত নেত্রযুগল যেন রৌদ্রতপ্ত লতার মতই নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

সেই আনত দৃষ্টিতে, শুভার সৌন্দর্য্য, ননীবাবুর চক্ষে নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিল। ননীবাবু মন্ত্রমুগ্ধবৎ

কয়েক মুহূর্ত্ত বাসিয়া থাকিয়া বলিলেন "আপনি আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট কচ্ছেন তজ্জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ।"

ননীবাবুর কথা কয়টি, শুভার অন্তরে এক নূতন তৃপ্তির সাড়া আনিয়া দিল। শত আনন্দ, শত আশ্বাস, তাহার চিত্তে বিদ্যুৎ-চমক জাগাইয়া, তাহাকে অচপল করিয়া তুলিল। শুভা নত মস্তকে ঈষৎ মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "এতে কি কষ্ট হতে পারে? মালী রোজ কত ফুল এনে দেয়, তা হ'তে আমি আপনার জন্য কিছু রেখে দি, ফুল জিনিষটা কারো অপছন্দ হয় না, তা ভেবে রাখতে দ্বিধা বোধ করি না।"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত শুভার মুখের প্রতি তাকাইয়া আগ্রহ মথিত কণ্ঠে বলিলেন "মানুষ যে এমন সুন্দর মালা গড়্‌তে পারে, ইহা আমি পূর্ব্বে ধারণা কত্তে পারিনি। এরূপ মালা গাঁথতে আপনাকে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট কত্তে হয়, সময়ও বড় কম লাগে না।"

শুভা জীবনে স্বীয় নিপুণতা সম্বন্ধে অনেক উচ্চ প্রশংসার কথা শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু কখনও তাহা এমন করিয়া তাহার হৃদয়কে সুখ-প্রদীপ্ত করিতে পারে নাই। আজ এই প্রশংসাটুকুই যেন তাহার আজন্ম সাধনা, কার্য্য সফলতা মণ্ডিত হইয়া, তাহাকে উন্মনা করিয়া ফেলিল। শুভা সাফল্যের নিশ্বাস প্রদান করিয়া, মৃদু হাস্যে বলিল "সে সব কিছু নয়। কোন কাজ কর্ম্ম নেই, চাকরের কাজ আপনার পছন্দ নাও হ'তে পারে, তাই আমি এসব নিজেই করে থাকি। এতে আমার এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না।"

অতঃপর শুভা ফুলগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া, যত্ন সহকারে ননীবাবুর শয্যা রচনা করিয়া, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার গমন কালীন হাতের সোণার চুড়ির ঝুন্‌, ঝুন্‌ শব্দটুকুন ননীবাবুকে যেন সসংজ্ঞ করিয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শুভা চলিয়া গেলে, ননীবাবু অনেক্ষণ পর্য্যন্ত অনড়, স্তব্ধ ও নত নেত্রে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন—উষা ও শুভা উভয়েই ত সুন্দর,—উভয়েইত দেখ্‌তে প্রায় সমান। শুভা উষার মতই বহুগুণে বিভুষিতা। না—তা নয়-ই, উষার সাথে শুভার ঠিক তুলনা হয় না। উষা যে আমার ছিল সব, উষা আমার জন্য কি না করেছে? আমার অসুখে চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, শিয়রে বসে কত রজনী কাটিয়ে দিয়েছে, স্বহস্তে আমার বেশ ভূষা না করালে তা'র তৃপ্তি হয় নি, সেই উষা আমার নেই? চির জীবনের মত চলে গেছে, আরত তাকে ফিরে পাব না? কয় দিন অনুপস্থিতের পর বাসায় ফিরে এলে,

তা'র উদ্গত আনন্দাশ্রু গোপন কত্তে না পেরে বিহ্বল হয়ে ছুটে এসে আমার বুকে মাথা রাখত। তা'র হস্ত লিখিত অনুরাগ সিঞ্চিত দীর্ঘ পত্রগুলি আমার বিদেশের নির্জ্জন বাসের সকল কষ্ট মুছিয়ে দিত, সে আজ কোথায়? হায়! কি অসীম সেই যাত্রা-পথ, ইহার সমাপ্তিই বা কোথায়? এই মহা যাত্রা-পথে মানুষ কেন এত বড় মায়ার আবরণে আপনাকে জড়িত করে? গুটিপোকার মত কয়েক দিন নিজের রচিত জালে আবদ্ধ থেকে, আবার সমস্ত সূত্র ছিন্ন করে, সেই অসীম যাত্রাপথে ছুটে চলে! ঐ যে ধূসর সাগরের জল নাচ্‌তে নাচ্‌তে অসীমের পানে ছুটে চলেছে, এর গন্তব্য স্থান কোথায় তা কি কেউ ভেবে দেখ্‌তে চায়? মানুষ ও সেই অজ্ঞাত গন্তব্য লক্ষ্য করেই চলেছে বৈত নয়!

ননীবাবু দুই হস্তে স্বীয় মস্তক চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া, সাগরের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জন সাধারণের সান্ধ্য ভ্রমণ ও বিশ্রামের জন্য যে

পুষ্পবৃক্ষ বেষ্টিত ভূমির মধ্যস্থ প্রস্তর বেদী নির্ম্মাণ করিয়া ছিল, — উহাতে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

তখন নির্জ্জন সমুদ্র বক্ষে সন্ধ্যালোক ফুটিয়া উঠিয়া ছিল। সমুদ্রের তীর রেখা, — পরপারের অসীম আঁধারের সহিত বিলীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নীল আকাশের নীচে,—শ্যাম-পত্রাবলীর মধ্যে —গোধূলীর শেষরশ্মি বৈচিত্রময় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ননীবাবু একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন— শুভা আমার জন্য কত কষ্টই না কচ্ছে,— কেন করে? আমি তা'র কে? অতিথি — এইত সম্বন্ধ! শুভা আমাকে ভালবাসে? আমাদের বিয়ে হবে? না— সেকি হয়? ঊষা তা হলে উপর হতে এসব দেখে কি ভাব্‌বে? দুটা দিন না যেতেই তাকে ভুলে যাব? ঊষার নিকট অবিশ্বাসী হব? তা কি হয়? ননীবাবুর মথা ঘুরিতে লাগিল। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঠিক সেই সময় কক্ষান্তরে,— হারমোনিয়মে তান ধরিয়া শুভা

গাহিতে ছিল —

এম্নি করে কাট্‌বে কি দিন
মোহ কি আর ছুট্‌বে না?
অতীত স্বপন সোহাগ বাঁধন,
ভুলেও কি আর টুট্‌বে না?
আপন খেলে দিবারাতি,
জ্বালিয়ে দিয়ে প্রেমের বাতি,
মোহের ঘোরে থাক্‌ছ মাতি—
শিউরে কি প্রাণ উঠ্‌বে না?
এম্‌নি করে কাট্‌বে কি দিন,
স্বপ্ন কি আর টুট্‌বে না?

নৈশ শীতল সমীরণের করুণা মাখা স্পর্শে, সেই সুধাতান আরও মধুরতম করিয়া তুলিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, গানের তান বুকে করিয়া যেন ছুটিতে লাগিল। ননীবাবু স্বরমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় মধুর গীতিসুধা কর্ণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। সেই স্বর ননীবাবুর নিভৃতকুঞ্জে স্বপ্ন মাধুরীর সৃষ্টি করিয়া উন্মত্ত; অধীর করিয়া তুলিল।

ইহার পর দুইটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ননীবাবুর অন্তরে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শুভার সৌন্দর্য্যের ও গুণের মাদকতায় ননীবাবুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। উমার স্মৃতিটুকুন ক্রমে ননীবাবুর অন্তরে, মেঘে ঢাকা তপনের ক্ষীণ রশ্মির মতই, এক আধ টুকুন মিটি মিটি জ্বলিতে ছিল। উহাতে না ছিল মোহ, না ছিল জ্যোতিঃ, না ছিল মাদকতা! ননীবাবু সময় সময় ভাবতেন যা চলে গেছে, শত চেষ্টায়ও যা ফিরে পাওয়া যাবে না, তার ধ্যানে, আকাশ কুসুমের কল্পনায়, জীবনটাকে অপব্যয় করে ফেল্‌লে কোনই লাভ নেই। উহা একান্ত সংকীর্ণ চিত্ততা ও দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক বলে প্রতিপন্ন হবে। ননীবাবু আপন খেয়ালে শুভাকে তা'র মানসী প্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া, নিজের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী করিয়া লইবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শুভার সন্ধ্যা বেলাকার চায়ের বৈঠকের উপর ক্রমে ননীবাবুর মৌতাত জন্মিয়াছিল। শুভা পরি-

বেশন না করিলে, ননীবাবু আহারে তৃপ্তি বোধ করিতেন না। খাদ্য জিনিষের স্বাদ যেন ততটা রসাল হইত না। অল্পদিনের মধ্যেই ননীবাবুর মনের গোপন কোণে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুভার সহজ সরল ব্যবহার, অবাধ কথাবার্ত্তা, গোপনে প্রাণের ভিতর একটা আশার অঙ্কুর সৃষ্টি করিয়া, অসীম কামনার আসন বিস্তার করিয়া ছিল এরূপ সন্ধান ননীবাবু পাইয়া ছিলেন।

যে পৃথিবীতে তাঁহার মাখামাখি করিবার মত কোন জিনিষই স্থায়ী হইতে ছিলনা, হঠাৎ তাহারি মাঝে, মরচে ধরা তারগুলিতে কে যেন, কিসের একটা ঝঙ্কার লাগাইয়া দিয়াছিল। এই নূতন প্রেম-সমুদ্রের শীতল জলে ডুবিয়া যাইতে, তাঁহার সারা মন প্রাণ যেন ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছিল। ননীবাবু ভাবিতেন এই জটিল "বুকে পোষা" আকাঙ্ক্ষার বিষয় শুভাকে জানাইয়া, প্রাণের বোঝা দূর করিয়া ফেলি। কিন্তু তাহার কাছে মুখ খুলিতে

চাহিলেও, লজ্জা যেন বাঁধা কাটাইতে দিত না।

শুভার হাসি, তার গান, তার কথা শুনিবার জন্য ননীবাবুর প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত। রাত্রিতে সহরের গোলমাল থামিয়া গেলে, ননীবাবু আপনার মনটাকে কুড়াইয়া লইয়া ভাবিতে বসিতেন শুভার সৌন্দর্য্য, সরলতার জ্যোৎতি মণ্ডিত হাসিরাশি। মনে মনে ননীবাবু কখনও শুভার গলায় ফুলের মালা পড়াইতেন, কখনও তাহাকে আপন খেয়ালে, আর কত কি সাজে সজ্জিত করিতেন। ননীবাবু ঘুমের ঘোরে দেখিতেন শুভা যেন তাঁহার পাশে বসিয়া যুগ যুগান্তের মিলন গান গাহিতেছে। মুগ্ধ ননীবাবু আত্মহারা হইয়া যেন দেখিতেন তাঁহার হৃদয়দ্বারে দেবী দাঁড়াইয়া, নীরবে তাঁহাকে বরণ করিয়া, প্রাণের গোপন পুরীতে অভিষেক করিয়া নিতে বলিয়া দিতেছে!

এই স্মৃতির নেশায় মস্‌গুল হইয়া, ননীবাবুর দিনগুলি, দম্‌কা বাতাস লাগা, ভরা পালের মত, বেশ্‌ ছল্‌ ছল্‌ শব্দে, সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—— x ——

ননীবাবুর যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন বেলা ছয়টা বাজিয়াছিল প্রভাতের আলোক ছটা তখন মাত্র ধরণীর বুক ছাইয়া পড়িয়াছিল।

ননীবাবু "গোছল খানা" হইতে হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া, বারেন্দায় আসিয়া দেখিলেন, শুভা চায়ের টেবিলের সন্নিকটে, একাকী বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছে। শুভা উরু-দেশে বাম কনুই, তাহারি উপর বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়াও দাতের ক্ষীণ শুভ্র রেখা এক আদ টুকুন দেখা যাইতেছিল। চক্ষু দুইটি স্থির, যেন কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের পানে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট! দক্ষিণ হস্তে একটি প্রস্ফুটিত তাজা গোলাপ ফুল, ঠিক যেন চিত্রকরের কল্পিত সাধনার মানসী মূর্ত্তিরূপেই বিরাজিতা!

একাদশ পরিচ্ছেদ

অদূরে "গেটের" সম্মুখে দণ্ডায়মান ভাড়াটে গাড়ীর অশ্বযুগলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ননীবাবু শুভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আজ আপনি এত নীরব, এর মানে কি ?"

শুভা মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রফুল্ল-স্মিত মুখে, কোমল কণ্ঠে বলিল "ফের্ যদি আমাকে "আপনি" বলেন,— তবে উত্তর দোব না মশায় ! বুঝ্লেন ?"

ননীবাবু ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া স্খলিত বচনে বলিলেন "থুরি— এই যা— আসল কথা ভুলেই গেছি ! এই আপনি— না,—তুমি,—বুঝ্লে কিনা, এমনি করে কেন বসে রয়েছ ?"

শুভা অপ্রতিভ হইয়া,— মাটির পানে দৃষ্টি নত করিল। শেষে স্মিত আস্যে বলিল "যান্— আপনি ভারি দুষ্টু।"

ননীবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "তা— অনেকটা বটে,—ছেলে বেলায় গুরু মহাশয় অনেক-দিন আমার জ্বালায় অস্থির হয়ে,— ঠিক এ-কথাই

বলেছেন। আচ্ছা সে কথা যাক্‌, —আমার প্রশ্নের উত্তর চাঁপা দিলে চল্‌বে না-ই।"

শুভা সম্ভ্রমে মিনতি-মিশ্রস্বরে বলিল "আজ আর সীমাচল যাওয়া হবে না। **Dolphin's Nose** দেখে আসার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মার জ্বর হয়ে সব মাটি করে দিল।"

ননীবাবু উৎকণ্ঠেরভাব দেখাইয়া বলিলেন "কখন জ্বর হল? আমাকে রাত্রিতে ত কিছুই জানান হয় নি!"

শুভা করুণ ও ভক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল "তেমন কিছু হয় নি। ঘুম ভাঙ্গিয়ে আপনাকে জানাতে বাবা নিষেধ করেছিলেন, — তাই জানান হয় নি।"

ননীবাবু ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উদ্‌গ্রীবের ন্যায় গৃহিণীর শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী ননীবাবুকে সম্মুখে দাঁড়ান দেখিয়া বলিলেন "এস বাবা! বস।"

ননীবাবু শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া গৃহিণীর গায়, কপালে হাত দিয়া শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা

করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন "গায়ে বোধ হয় খুবই সামান্য জ্বর রয়েছে,— একজন ডাক্তার ডেকে আনা যাক্।"

গৃহিণী কৌতুকপূর্ণ নেত্রে ননীবাবুর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "ডাক্তারেব কোনই দরকার নেই,— সেরে যাবে এখন। **Acconite** এক দাগ খেয়েছি। কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে বসে ছিলুম,—তাই ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, সর্দ্দির ও আভাস পাওয়া যাচ্ছে।"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থকিয়া বলিলেন "অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা যায়গায় বসে থাকাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।"

গৃহিণী নিতান্ত সহজভাবে বলিলেন "তা চিন্তার কোনই কারণ নেই। সীমাচলে নেওয়ার জন্য গাড়ী এসেছে। তুমি জলযোগ সেরে ফেল। শুভাকে নিয়ে বেড়িয়ে এস। সীমাচল দেখ্‌বার জন্য শুভা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাঁধুনী ঠাকুর এতক্ষণ বোধ হয় তোমাদের রাস্তায় খাবার উপযোগী সমস্তই

ঠিক ঠাক করে ফেলেছে।" "টিফিন কেরিয়ারে" সব সাজিয়ে দিবে এখন। একটি চাকর সঙ্গে যাবে। কোনই অসুবিধা হবে না। এ অবস্থায় আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না।"

গৃহিণীর প্রস্তাবে ননীবাবু আপনাকে একটুকুন বিপন্ন বোধ করিলেন। একটি বয়স্থা সুন্দরী তরুণী সঙ্গে করিয়া একাকী বেড়াইতে যাইবে,— সে কি কথা? থাকলইবা চাকর সাথে? তাতে কি-ই আসে যায়? অথচ অস্বীকার করাও, চলিত যুগের সভ্যতা হিসাবে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়্‌বে! কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া ননীবাবু বলিলেন "আপনারা কেউ যাবেন না— বেড়িয়ে তৃপ্তি হবে না। আজ না হয় না-ই-বা গেলুম।"

গৃহিণী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "কাল গাড়ীর ভাড়ার টাকার অর্দ্ধেক "আগাম" দিয়ে তবে গাড়ী ঠিক করা হয়েছিল। ফিরিয়ে দিলে ভাড়ার টাকা ফেরত দিবেই না। তোমরা আজ বেড়িয়ে এস,— অন্য একদিন সকলে মিলে গেলেই হবে।"

ঠিক এমনি সময়ে অসিতবাবু হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গামছা হস্তে— গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "ননী কি বল্‌ছে ?"

গৃহিণী স্মিত মুখে বলিলেন "যাওয়া আজ স্থগিত রাখ্‌তে বল্‌ছে। আমরা কেউ যাব না,— বেড়ান তৃপ্তি কর হবে না,— তাই বল্‌ছে।"

অসিতবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "তাতে কি ? তোমরা বেড়িয়ে এস না,—অসুখ সারুক,— আর একদিন সকলে মিলে যাওয়া যাবে।" অতঃপর অসিতবাবু ননীবাবুকে সঙ্গে করিয়া প্রাতরাশ সমাপন করিয়া ফেলিলেন।

যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। শুভা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গাড়ীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শুভার পরিধানে একখানা "জরি পাড়দার" মান্দ্রাজী শাঁড়ি। উজ্জ্বল লাল রেশমের চওড়া পাড়টি, তাহার গৌর গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। গায়ে জরির পাড়দার নীল রঙ্গের

জ্যাকেট। বামস্কন্ধের নিম্নে, ইংরাজ দোকানের স্বর্ণের ব্রোচে অঞ্চলভাগ আবদ্ধ ছিল। মস্তকের কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি, বাদামী রঙ্গের রেশমী ফিতায় আবদ্ধ হইয়া, পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

ননীবাবু শুভাকে লইয়া যখন যাত্রা করিলেন তখন বেলা আটটা বাজিয়া ছিল। অদূরে পর্ব্বতের শিরোভাগে সূর্য্যদেব সমাসীন হইয়া, খণ্ড খণ্ড কালমেঘের সহিত লুকচুরি খেলিতেছিলেন। তরুলতা সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতগাত্র ক্ষণিক আলো ও আঁধারের সমাবেশে, যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিংড়াইয়া লইয়া, পরিপূর্ণ সুষমায় হাসিতে ছিল। ক্রমে অসমতল রাস্থা অতিক্রম করিয়া, — ওয়াণ্টায়ার হইতে ভাইজাগ পর্য্যন্ত, — পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তৃত, — সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া — গাড়ী দ্রুত ছুটিতে লাগিল। গাড়ী পাহাড় ঘুরিয়া সীমাচল গ্রামে যখন পৌছিল, — তখন বেলা সাড়ে আটটা বাজিয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শুভা এতক্ষণ নীরবে বসিয়া পাহাড়ের দৃশ্যাবলী অবলোকন করিতেছিল। হঠাৎ ননীবাবুর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া স্মিত মুখে বলিল "ঐ পাহাড়ের গায়ের যে ক্ষীণ-বক্র রেখাটি দেখা যাচ্ছে—ওটা কি ?"

ননীবাবু সহজ ভাবে বলিলেন "বোধহয় নীলাচলে উঠ্‌বার প্রস্তর-বদ্ধ সোপান শ্রেণী।"

শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত অপলক দৃষ্টিতে সেই ক্ষীণ রেখার প্রতি তাকাইয়া বলিল "আচ্ছা— এমন দৃশ্য দেখ্‌তে আপনার কেমন লাগে ?"

"খুবই ভাল লাগে। যা'র শরীরের ভিতর খাটী প্রাণ আছে, তারই মন আকৃষ্ট হ'বে,—সন্দেহ নাই। ওখানে পৌঁছলে দেখ্‌বে স্থানটি কত মনোরম। ঝরণার দৃশ্যগুলি দেখ্‌লে, জগতের সমস্ত আকর্ষণ ভুলে যেতে হয়। ভগবানের সৃষ্টি চাতুর্য্যের উপর একটা ভক্তি আপনা হতেই এসে দাঁড়ায়।"

শুভা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া একটি ক্লান্তির

নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। শুভার কপালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদ বিন্দু,— যেন মুক্তার মতই দেখাইতে লাগিল। শ্রম কাতরে,— ঈষদুন্নত বক্ষ, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাসে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ননীবাবু একটুকু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "এ-রি মধ্যে-ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ দেখ্‌ছি? ঠিকা গাড়ীর যে ঝাঁকুনি,—তাতে শরীরের আর দোষ কি?

শুভা একটুকু অপ্রতিভ হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখখানা মুছিয়া ফেলিল এবং মৃদু হাস্যে বলিল "তা কিছু নয়, গাড়ীর ঝাঁকুনি বড্ড বেশী, এখন গাড়ী হতে নামতে পারলেই রক্ষা পেতুম।"

বেলা নয়টায় গাড়ীখানা সীমাচলের তোড়ণ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে সকলেই অবতীর্ণ হইলেন। গাড়ওয়ান ও চাকরকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়া, ননীবাবু শুভাকে লইয়া পাহাড়ে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

শুভা ননীবাবুর বাম হস্ত ধারণ করিয়া বলিল এ কি কচ্ছেন? জুতো নিয়ে যাচ্ছেন যে? গাড়ীতে

জুতো রেখে যান! এ-যে হিন্দু-তীর্থ—তা' বুঝি ভুলে গেছেন। আমি জুতো গাড়ীতেই খুলে রেখে এসেছি।"

ননীবাবু একটুকুন অপ্রতিভের ভাব দেখাইয়া বলিলেন "গোড়ায়ই গলদ, ভাগ্যি তোমার চোখে পড়েছিল, তা না হলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।"

অতঃপর ননীবাবু জুতা জোড়া খুলিয়া গাড়ীতে রাখিয়া দিলেন এবং নগ্ন-পদেই যাত্রা করিলেন।

বহু সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন গঙ্গা-ধারার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শুভা ননীবাবুর প্রতি তাকাইয়া বলিল "আরও এরূপ কত সিঁড়ি ভাঙ্গতে হবে ?"

"এখনও চা'র আনি পথ আসিনি, এর-ই মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে ? প্রায় সহস্রাধিক সিঁড়ি ভাঙ্গতে হ'বে। এস এখানে একটুকুন বিশ্রাম করা যাক্।" বলিয়া উভয়ে একখানা প্রস্তর-বেদীর উপর উপবেশন করিল।

কয়েক হস্ত উপর হইতে গঙ্গাধারার স্বচ্ছ বারি-

ধারা খুব বেগে অনবরত নীচে পড়িতেছিল। পাশে দোকান, স্ত্রীলোকেরা ফুল ও ফুলের মালা বিক্রী করিতে ছিল। শুভা কিছু ফুল ও ফুলের মালা ক্রয় করিয়া লইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া শুভা সাগরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ দেখুন—এখান হতে সাগর কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে,—এত ঢেউ, তবু একখানা নীল কাপড়ের মত যেন পড়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কাল ময়দানের উপর সাদা গরুগুলি কত ছোট দেখাচ্ছে! নারিকেল, দেবদারুর সারিগুলি যেন ছোট গাছের মত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।"

ননীবাবু কৌতুক পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিলেন "এই দৃশ্য দেখ্বাব জন্য কত-শত লোক এখানে বেড়াতে আস্ছে। পাশের ঝরণার দৃশ্যটি দেখ,—আরও কত সুন্দর। একটি শিব লিঙ্গের মস্তকের উপর জলধারা অনবরত পড়্ছে। কোন দিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই,—চির বাঞ্ছিতের উদ্দেশে যেন,—প্রেম-ধারা বিলিয়ে ঝর্ ঝর রবে, আপনমনে ছুটে

যাচ্ছে।"

শুভা ননীবাবুর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিল,— এবং নীরবে গাত্রোত্থান করিয়া ননীবাবুকে উঠিতে সঙ্কেত করিল।

উভয়ে আবার সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমে "স্তূপ-মণ্ডপে" নরসিংহ দেবের মন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বহু প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহ বিরাজিত। তাহারা প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল। প্রায় পনর মিনিট পরে— শুভা ননীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "নরসিংহ দেবের বিগ্রহটি দেখাচ্ছে না কেন?"

"অক্ষয় তৃতিয়া দিন,— বৎসরে মাত্র একদিন যাত্রিগণ বিগ্রহটি দেখ্‌তে পারে। এখন চন্দন কাষ্ঠে আবৃতাবস্থায় মন্দিরের ভিতর অবস্থান কচ্ছেন।"

শুভা স্মিত মুখে বলিল "এই বিগ্রহটি এখানে প্রতিষ্ঠিত করবার কি কারণ রয়েছে?"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন "হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে,—তাঁহার বুকের উপর সিংহাচল পাহাড় চেপে দিয়েছিলেন। বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ করে, ভক্তের বুক হতে পাহাড় সরিয়ে দিয়ে রক্ষা করে দিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। সেই হতেই নাকি এখানে এই বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

শুভা আর কোনই প্রত্যুত্তর না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শেষে উভয়ে সীমাচল দর্শন করিয়া **"Valley garden"** হইতে যখন **"Dolphin's nose"** এ আসিয়া পৌঁছিল তখন বেলা দুইটা বাজিয়া ছিল।

রাস্তার দূরত্ব ও দুর্গমতার জন্য শুভা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে পাহাড়, বামে বৃক্ষ-লতা সমাচ্ছন্ন গম্ভীর খাদ,—মাঝে পাথরের রাস্তা,—শুভা ধীরে ধীরে তাহার দক্ষিণ হস্ত ননীবাবুর স্কন্ধে বিস্তার করিয়া দিয়া,—পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল। শুভা ক্রমে আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার

শরীরের সমস্ত ভার ননীবাবুর শরীরে ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অতিকষ্টে পর্ব্বতের শিরোভাগে আরোহণ করিয়া উভয়েই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

Dolphin's nose এর পাদমূলে আহত হইয়া, সাগরের তরঙ্গ গুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল ও সুনীল জলরাশি তরঙ্গ ভঙ্গিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। কি সুন্দর দৃশ্য, সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল নীল জল,— পশ্চাৎ দিকে কেবল পর্ব্বত মালা,— সমুদ্র ও পর্ব্বত বেষ্ঠিত ভূমি খণ্ডের উপর **Light house** টি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সমুদ্রের ঢেউগুলি একটীর পর আর একটি ছুটিয়া আসিয়া **Light house** এর পাদমূলে ফেণরাশি উদগীরণ করিয়া স্বায় বেগ সংহত করিতেছিল। ননীবাবু শুভাকে লইয়া একখণ্ড বিস্তৃত পাথরের উপর উপবেশন করিয়া, সেই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিয়া,— ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য, শুভা আধা শোয়া, আধা বসার মত, পাথরের উপর বাত হইয়া, সীমাহীন সাগরের দিকে মুখ করিয়া তাকাইয়া রহিল। শেষে ননীবাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তে উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। ননীবাবু শুভার মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া, ঠিক তাহার মাথার উপরই স্বীয় মস্তক আনত করিয়া, অপলক দৃষ্টিতে শুভার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

চারিদিক নিস্তব্ধ,— এমনি সময় দুইটি তরুণ ও তরুণী, রূপের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া, নীরবে একে অপরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল! এক নূতন অনাস্বাদিত অনুভূতি উভয়ের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল,— যাহার নিকট পর্ব্বতের অতুলনীয় শোভা, সাগরের অপরূপ দৃশ্য,— সমস্তই যেন

নিতান্ত তুচ্ছ,— নিতান্ত হীন বলিয়া, তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছিল। যেন উভয়েই সংজ্ঞা হারাইয়া, —জীবন মরণ,— পাপ পুণ্যের স্মৃতি হারাইয়া,— আত্ম তৃপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল। সমস্ত চিন্তা,— সমস্ত সাধনা যেন কোন এক বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া,— উদ্বেগ-কাতর-অপলক-নয়নের দৃষ্টি বিনিময়ে, ধরার সমস্ত অমৃত-সুধাটুকুন আহরণ করিবার জন্য আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল।

অতর্কিত উদ্বেগে দেহ, মন বিভোর করিয়া তাহারা যেন তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল,—এজগতে যেন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই,—কেবল তাহারা দুইটি তরুণ তরুণী বিরাজ করিতেছে,— আর যেন সমস্ত অসীম—অন্ধকারাবৃত। কত কাল, কত যুগ ধরিয়া তাহারা যেন এই অসীম ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। অভিধানের সমস্ত শব্দগুলি জড় করিয়া তাহারা যেন এক অসীম মিলন গান গাহিবার জন্য সুর সাধনা করিতেছে। তাহারা যেন শরীরের অনু পরমাণুতে এক মাদ-কতা জাগাইয়া তুলিয়া ভাবিতেছিল—সুধু তুমি

ও আমি; আর কিছু নাই,— যেন সেই তুমি ও আমির সংমিশ্রণের মধ্যে জগতের সমস্ত অস্তিত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে।

শুভা হঠাৎ উঠিয়া বসিল। প্রাণের অসীম ভাবোন্মাদনায়, তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া, ননীবাবুর স্কন্ধ মস্তক সংরক্ষণ করিল এবং অপলক দৃষ্টিতে ননীবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গাপ্লুত জলরাশি,— শত আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া, অসীমের পানে ছুটিতেছিল। শুভার অন্তরের আবেগ যেন সেই সাগরের উন্মাদনার চেয়েও কত ভীষণ আবর্ত্তময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে— শুষ্কলতা, শ্রাবণ ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, যেমন নবীন ও সতেজ হইয়া উঠে,— শুভার মস্তক স্পর্শে ননীবাবুর প্রাণও যেন এক নূতন আলোক লাভে, অভিনব ভাবে জ্যোতির্দ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ননীবাবুর চোখে পৃথিবীর সমস্ত বর্ণ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার

পায়ের নীচের মাটী যেন দুলিয়া উঠিল। নিবাত-নিষ্পন্দ প্রদীপের মতই ননীবাবু আড়ষ্ট অভিভূত-বৎ বসিয়া রহিলেন, শেষে শুভার বামহস্ত স্বীয় হস্তে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিলেন।

সে কি অনুভূতি! কেবল স্পর্শের দ্বারাই বুঝি সেই— অনুভূতির পরিমাণ ধারণা করা সম্ভবপর! গায়ক যেমন হারমোনিয়মের পর্দ্দাগুলি স্পর্শ করিয়া প্রাণের সুর জাগাইয়া তোলে,— চিত্রকর যেমন তুলি হাতে লইয়া অন্তরের আরাধ্য মূর্ত্তি গড়িয়া, কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করে,— ননীবাবুও এই স্পর্শের মাঝে তেমনি এক ভাবাবেশ যেন শোণিতের তালে তালে প্রবাহিত করাইয়া, এক পুলক-শিহরণ বরণ করিয়া লইলেন।

ননীবাবু শুভার পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন "শুভা!"।

শুভাও স্থির দৃষ্টি ননীবাবুর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া ডাকিল "ননি"

সেই স্বর-লহরী বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া, হাওয়ার সাথে সাথে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে সেই শব্দধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অসীমে মিশিয়া গেল। চারিদিক হইতে একটা বিরাট নিস্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিল, কাহারও মুখে আর কোন বাক্য স্ফূর্তি রহিল না। এই দুইটা শব্দে যেন কত বেদনা, কত সুখ কত স্নেহ-সুধা বিজড়িত ছিল। এই শব্দ দুইটির ভিতর যেন কত ব্যাকুল-প্রাণের কথা সংমিশ্রিত এবং প্রত্যেক শোণিত কণায় সঞ্চিত, প্রত্যেক স্বপ্নে বিজড়িত, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে প্রবাহিত প্রেমের কথায় ভরপুর।

তাহারা বহুক্ষণ একই ভাবে বসিয়া রহিল। তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা যেন প্রাণের সমস্ত উদ্বেগ নিঃশেষে বাহির করাইয়া দিতে লাগিল। একটা পবিত্র শোণিত ধারা ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া যেন অনন্ত নিঃস্রাবের ন্যায় সমস্ত কালিমা বিধৌত করি-

ফেলিতে লাগিল।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতে লাগিলেন। যেন একখানা রঙ্গিন থালার আকার ধারণ করিয়া, সমুদ্রের জলের গায় ঢলিয়া পড়িয়া, সাঁতার কাটিতে লাগিলেন। বিদায় কালিন তপনের সেই রশ্মি-রেখা যেন পাহাড়ের গায় বিদায় চুম্বনের মতই, দাগ বসাইয়া দিতে লাগিল। সায়াহ্নের শীতল সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া, শুভার শিথিল অঞ্চল দুলাইতে লাগিল। দুই এক গুচ্ছ চুল, বাতাসের সহিত লড়াই করিতে করিতে, কপোল দেশে নিপতিত হইয়া,— উভয়ের ভিতর যেন আবছায়ার সৃষ্টি করিয়া দিল। অদূরে **Light House** এর আলো জ্বলিয়া উঠিল। উজ্জ্বল আলো যেন তরঙ্গের গায় নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতে লাগিল।

ননীবাবু গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া করুণ ও আর্ত্তপূর্ণ স্বরে বলিলেন "শুভা! সন্ধ্যা হয়ে এল, এস এখন নীচে নেমে যাই।"

শুভা একটা অস্ফুট ধ্বণী করিয়া,— তড়িৎ-পৃষ্টের মতই উঠিয়া দাঁড়াইল। শেষে সেই নির্জ্জনে

পাথরের রাস্তা বাহিয়া, দুইটি তরুণ তরুণী, একান্ত নির্ভরে, উভয়েই উভয়ের স্কন্ধে ভর করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

তখন গোধূলী অবসান প্রায়। দ্বাদশীর রাত্রি, জলধির বক্ষে, কম্পন জাগাইয়া, চন্দ্রমা-সুধাময়হাস্যে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া দিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সাতটায়, শুভা এক খানা রেকাবে করিয়া লুচি, হালুয়া, পটল ভাজা এবং রজত নির্ম্মিত পিয়ালায় করিয়া ধূমায়িত এক "কাপ" চা আনিয়া, অসিতবাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিল। গৃহিণী নিকটেই বটি লইয়া কুটনা কুটিতেছিলেন,— শুভা জননীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, তরকারিগুলি বাছিয়া বাছিয়া, জননীর হস্তে তুলিয়া দিতে লাগিল।

অসিতবাবু চা'য়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন "আঃ— বেশ্ স্বাদ হয়েছে। শুভা বেশ্ চা' তৈরি কত্তে শিখেছে।" ইহার পর অসিতবাবু এক পোয়ার মত হালুয়া, প্রায় দিস্তা খানেক ফুল্‌কা-লুচি এবং কয়েক খানি পটল ভাজা কয়েক মিনিটের মধ্যেই, নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন, শেষে পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইয়া, গরম চা'য়ে ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগিলেন।

গৃহিণী সহাস্য বদনে, অসিতবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ননীবাবাজীও শুভার তৈরি চা'র খুবই তারিফ করে,— শুভার কাজ কর্ম্ম সে খুবই পছন্দ করে।" অতঃপর গৃহিণী শুভার প্রতি দৃষ্টি ঘুড়াইয়া, কোমল কণ্ঠে বলিলেন "যা— মা! ননীকে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

শুভা একটুকুন চকিতা হইয়া, জননীর প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে তাকাইয়া রহিল। শেষে ধড়-মড়িয়া উঠিয়া, ধীরে ধীরে ননীবাবুর কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

অসিতবাবু চা'পান শেষ করিয়া, একটি তাম্বুল মুখে গুঁজিয়া দিলেন। পরে গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া স্মিত মুখে বলিলেন "সেই কথাটা আজই ননীকে বলে ফেল না কেন?"

গৃহিণী "ডালনার আলু কাটিতেছিলেন, অসিত বাবুর প্রতি তাকাইয়া, একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "শুভার বিয়ের কথা? তা-আজই বল্‌ব বলে মনে করেছি। তবে ননী কি ভাব্‌বে তাই চিন্তে কচ্ছি।"

অসিতবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আরে ভাব্‌বার কিচ্ছু-নেই এ-তে-। অভিবাবক বল্‌তে সে নিজেই তা'র অভিবাবক, তার কাছেই কথাটা খোলাসা করে বলা দরকার। এবিষয়ে লজ্জা কর্‌লে চল্‌বেই না, কি বল?"

গৃহিণী স্বর নত করিয়া বলিলেন "না, লজ্জা কিছুই নেই এ-তে। আর বিশেষতঃ ননী ঠিক আমার ঘরের ছেলের মতই মেলা মেশা করে,— কোনটাতেই শঙ্কোচ বোধ করে না। শুভার সাথে

বিয়ে হলে,— বেশ্ মানাবে ভাল। দু'জনা যেন "হরিহর" আত্মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ বিয়ে হলে, কারো কিছু বল্‌বার থাকে না। বাপ মা যা' তা' ধরে বিয়ে দিলে,—দু'জনার মনেই যথেষ্ট আপশোষ থেকে যায়।"

অসিতবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "বিয়ের পূর্ব্বে তোমার সাথে আমার ত দেখা শুনা হয় নি,— তোমার মনে বোধ হয়, তা হলে যথেষ্ট আপশোষের কারণ হয়েছিল।" বলিয়া অসিতবাবু হোঁ, হোঁ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন "আমি কি তাই বল্‌লুম? তোমার— আমার,— সে হল গিয়ে তোমার পৃথক কথা।"

অসিতবাবু স্মিত-মুখে বলিলেন "সে আবার কি? খুলেই বল না?"

গৃহিণী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "বিয়ের পূর্ব্বে আমিত আর কাউকে পছন্দ করে বসে ছিলুম না, আর বিশেষতঃ তুমিও চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বুড়া

ছিলে না;—তবে বিয়ের পরে তুমি রাগ করে ক'দিন দূরে সরে থাক্‌তে, আমার বিছানায় শুইতে চাইতে না। তা' আমি সুন্দরী ছিলাম না কি না,— তাই তোমার বোধ হয় আপশোষের কারণ হয়ে ছিল,— কিন্তু সে ক'দিনের জন্য মাত্র।"

প্রত্যুত্তরে অসিতবাবু কয়েক মূহুর্ত্ত হাসিয়া, কাসিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তাই বুঝি? বেশ্ লোক কিন্তু তুমি যা' হ'ক! দোষ যে তোমারি, তা বুঝি কোন দিনই ভেবে দেখনি? "বাসর" রাত্রিতে কথা বলাতে,— আমি তোমাকে কত সাধ্য সাধনা করেছিলুম। তুমি কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ অটল হয়ে ফিরে রইলে, তাই আমি রাগ করে, কাজ হাসিল করে ছিলুম। এটা একটা **policy** বইত নয়। এই ধর—সকল বিভাগের লোকই যখন মাহিনা বাড়াবার জন্য চীৎকার কত্তে লাগ্‌ল,— ধর্ম্মঘটের ভয় দেখাতে লাগল্, ঠিক সেই সময়েই **Retrenchment Committee** বসে,— একেবারে সব উল্টে দিলে। এও ঠিক তা'রি মত।

শেষে যখন তুমি আত্মসমর্পণ করলে,— তার পর ত বুঝ্‌তেই পেরেছ।”

গৃহিণী মুখে কাপড় দিয়া অনেক্ষণ হাসিলেন, শেষে একটুকুন আত্মস্থ হইয়া বলিলেন “তুমিও একজন কম “ঢঙ্” ছিলেনা। তোমার জন্য রাত্রিতে কার সাধ্যি ছিল ঘুমোয়, কি উৎপাতই,— থাক সে কথা। বুড়ো বয়সে আর সে সব কথা ঘাটালে মন খারাপ হয়ে যায়। তবে আমি বল্‌ছি কি, উভয়ের সম্মতি ক্রমে বিয়ে হলে, শেষে আর মুখ ফুলাফুলির কারণ থাকৃতে পারে না।”

অসিতবাবু দৃঢ় স্বরে বলিলেন “এ তোমার মস্ত ভুল ধারণা। প্রাতীচ্যের অধিবাসীর মধ্যে “কোর্ট-সিপ্” হয়েই ত বিয়ে হচ্ছে। অমতে কারো বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই-ই। কিন্তু বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করবার মামলা, ঐ দেশের মত হিন্দুদের কি হ’তে শুনেছ? তবে বর্ত্তমান যুগে ঐ রূপ মামলা, আমাদের দেশে যে দুই একটা হচ্ছে,— তা প্রায়ই সে দেশের আলোক প্রাপ্ত, বড় লোকদের ভিতরই দেখা যায়।”

গৃহিণী কোমল কণ্ঠে বলিলেন "সতীত্ব বলে একটা জিনিষ তাঁরা মেনে চলে না বলেই এ সমস্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। সামান্য মনোমালিন্যেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে চায়। সমাজ যদি এর ভিতর এসে দাঁড়ায়, সামাজিক শাস্তির বিধান হয়, তবে মেয়েরা স্বামীকে, আমাদের দেশের মতই, চির নিজস্ব বলেই মেনে নিতে পারে। স্বামীর ভিতর দেবত্ব, সুন্দরত্ব ও আনন্দের সন্ধান তারা কোন দিনই বোধ হয় পেতে চায় না। বাস্তব জগতে স্বামীকে দেবতা মেনে নিলে যে অনেক বেশী মাধুর্য্য ও আনন্দ উপভোগ করা যায়,— এরূপ ধারণা কত্তে তাঁরা শিক্ষালাভ করে না। মরণ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, স্বামীর সঙ্গ লাভও সেরূপ স্ত্রীলোকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষাভিমানী নারীর বিপরীত যুক্তি তর্ক সমস্তই ভণ্ডামী মাত্র!"

অসিতবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "তা অনেকটা বটে। তবে এর খাঁটী কারণ আমার মনে হয়, তরুণ তরুণীর মধ্যে অবাধ মেলা মেশায় আসঙ্গ

লিপ্সাই, ভালবাসার মুখোস পরে,— তা'দের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কাজেই সহজে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। একটির পর একটির নূতন সংস্পর্শে, তাদের আকাঙ্ক্ষাই বেড়ে উঠে,— তৃপ্তির সন্ধান তা'রা পায় না। মন একবার বিদ্রোহী হলে, সংযত করে রাখা খুবই কষ্ট কর হয়ে দাঁড়ায়।"

গৃহিণী স্মিত মুখে বলিলেন "সব সময়েই যে এ-তে কুফল ফল্‌বে, এরূপ নিয়ম নেই।"

অসিতবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন "তা নেই বটে, তবে শিক্ষায় সবই সংযত কর্ত্তে পারে। উনুনের পার্শ্বে ঘৃতের ভার সাজিয়ে, ঘৃত জমাট রাখার মত চেষ্টা, কোন দিনই সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে না বলে মনে হয়। মনে কর পঁচিশ বছরের যুবা আর ষোল বছরের যুবতীর সাথে যদি অবাধ মেলা মেশার সুযোগ ঘটে, তবে নির্গুণ বা কুৎসিতের দোহাই দিয়ে, কেহই গা বাঁচিয়ে চল্‌তে পারে না। উভয়েই তন্ময় হয়ে পড়ে, কিছু দিন

পরে যখন বিচার করবার ক্ষমতা এসে পড়ে, এবং বিনা আয়াসে নূতনের সঙ্গ সুখ লাভের সুযোগ ঘটে, তখনই গোলযোগ এসে দাঁড়ায়। অভিভাবকগণ ভালরূপ বিচার করে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করলে, প্রায়ই সুফল ফলতে দেখা যায়। তবে এসব কথা বর্ত্তমান যুগে একেবারে "কুসংস্কার" বলেই উড়িয়ে দিতে চায়। অবশ্য আমি সমাজকে একেবারে সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিতে বলছি না। সকলেই সংযমী হ'ক এটা খুবই বাঞ্ছনীয়। সকলেই মনোধর্ম্মকে সংযত ভাবে বিবেকানুমোদিত পথে পরিচালিত কত্তে পারলেই মনুষ্যত্ব লাভ কত্তে সক্ষম হয়। সতীত্ব হচ্ছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ। সতীত্ব সংজ্ঞা ধরিতে গেলে, হিন্দু সমাজেরই বৈশিষ্ট। কাজেই হিন্দুগণ এবিষয়ে প্রতীচ্যের অনুকরণ করলে সতীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারবে না। সতীত্ব পাতিব্রত্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সংযত চিত্তে পতির সেবাই পাতিব্রত্য বা সতীত্ব। যা'দের ভিতর সংযমের অভাব, তিনি বিদুষী, সুশিক্ষিতা হলেও

পাতিব্রত্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।”

ঠিক এমনি সময়ে শুভা ননীবাবুকে সঙ্গে করিয়া কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। ননীবাবু নম্র স্বরে গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “মা! আমাকে ডেকেছেন?”

গৃহিণী সহাস্যে ননীবাবুর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিলেন “হাঁ-বাবা! ডেকেছি বস এখানে।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ননীবাবু একখানা টুলের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং চিন্তা-ম্লান মুখে, গভীর আগ্রহ ভরে গৃহিণীর প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। শুভা জননীর পার্শ্বে নতমুখী হইয়া বসিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকার পর, অসিত বাবু স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিলেন “বাবা ননি! কয়েক দিন হয়, এই কথা কয়টি তোমাকে বলব বলে মনে

ক'চ্ছি, কিন্তু নানা কারণে, এতদিন তা বলে উঠতে পারিনি। তুমি অল্প বয়সে বিপত্নীক হয়েছ, তা'তে অভিভাবক হীন। সংসারে তোমার কোনই বন্ধন নেই। অনেকে স্ত্রী হারিয়ে, প্রথম প্রথম উন্মাদ, পাগল সাজে, কেউবা স্ত্রীর ছবি ধ্যান করে ভাল বাসার পরাকাষ্ঠা দেখায়, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের কথা শুনলে কামড়াতে চায়! কেহবা সন্ন্যাসী সেজে পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে বেড়ায়। তার পর কেহবা দিন কয়েক না যেতেই আবার সুর সুর করে "বিয়ে পাগলা" সেজে উঠে। তোমার ভিতর এর কোনই লক্ষণ প্রকাশ পায়নি বলে আমি এতটা বলতে সাহসী হয়েছি।" বলিয়া অসিতবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। শেষে সংযত স্বরে বলিলেন "শুভার বয়স হয়েছে। শীঘ্রই তা'কে পাত্রস্থ কর্ত্তে চাই। তোমার হাতে শুভাকে তুলে দেয়, এই তার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা। এই বৈশাখ মাসেই আমি শুভ কার্য্য সম্পন্ন কর্ত্তে চাই। পুরীতে সমুদ্রের ধারে আমার একটি বড় বাড়ী আছে। সেখানেই

এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তে চাই। আমি সমস্ত আয়োজন ঠিক কর্ত্তে, সকলকে নিয়ে কলিকাতা যাব মনে করেছি। তুমিও পূর্ব্বাহ্নে আমার বাসায় ঠাকুর চাকর নিয়ে, দিন কয়েক বাস কর। আমি বিয়ের কয়েক দিন পূর্ব্বে সেখানে গিয়ে কাজ সুসম্পন্ন করে ফেল্‌ব মনে করেছি। তুমি এবিষয়ে অমত করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।" বলিয়া অসিতবাবু ননীবাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

ননীবাবু কিছুকাল নিরবে থাকিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। সেই মিষ্টি হাসিতে, তাঁহার বিস্ময় বিহ্বল কালো চোখের সমস্ত বিস্ময় বিধৌত হইয়া, একটা স্বাভাবিক স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ননীবাবুর উদ্বেগাকুল চিত্তে এই প্রস্তাব যেন শীতল প্রলেপ বুলাইয়া সমস্ত অস্বস্তি বিদূরিত করিয়া দিল। এত দিন ভাবি সম্পর্কের স্মৃতি টুকুন মনের মধ্যে খাড়া ছিল, আজ শুভার প্রতিমাখানা মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার প্রাণময় হইল। ননীবাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শুভা আমার অনুশাসনের

প্রতিষ্ঠিত দেবী ! তা'র সাথে অন্য করো তুলনা হতে পারে না। এতরূপ, গুণ, এত স্নেহ, আর কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়-ই ! এত দিন শুভাকেই ত মানসী প্রেয়সী কল্পনা করে, বিপুল নির্ভরে, নিতান্ত আপন করে নিতে চেয়েছিলুম। এই বিয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করবার কিছুই ত খুঁজে বেড় করতে পাচ্ছি না। ননীবাবু শুভার মুখের প্রতি দৃষ্টি ঘুড়াইয়া, সঙ্কোচহীন ব্যবহারে, সম্মতি প্রদানের মতই একটা ইঙ্গিত ব্যক্ত করিলেন। শেষে সসঙ্কোচে বাহিরের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

অসিতবাবু কয়েক মুহূর্ত সন্তুষ্ট চিত্তে গানের একটা স্বর গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া, নীরবে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

শুভা এতক্ষণ নিতান্ত ফাঁপরে পড়িয়াছিল। সে কক্ষ মধ্যে আটক পড়িয়া, তাহারি বিবাহের কথা শুনিতেছিল। তাহার চক্ষু, মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। সে পলাইবার পথ খুঁজিতে ছিল। অসিত

বাবু চলিয়া গেলে, শুভা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। শেষে নবীনবাবুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, একটুকুন মুচ্কি হাসিয়া, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

গৃহিণী স্থির নেত্রে নবীনবাবুর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "দেখ নবি! তোমাকে আর চাকুরীতে ফিরে যেতে দিতে আমাদের ইচ্ছা নেই। তোমার উপরওয়ালার ব্যবহারের কথা শুনে "উনি,' বল্লেন, চাকুরী আজ কাল বড়ই ঝঞ্ঝাটে হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাকর আর মনিবের সম্বন্ধ "দা আর কুমড়া" নয়-ই। নিম্নতম কর্ম্মচারীর দোষের অভাব নেই, অন্ততঃ ইচ্ছা করলে, দোষ বের করা তত কঠিন কাজ নয়। এ অবস্থায় যদি উপরওয়ালা, দিন রাত পিছন লেগে থাকে, তবে নিম্নতম কর্ম্মচারীর বিপদ পদে পদে ঘট্‌তে পারে। "আসানসোল্" আমাদের একটা কয়লার খনি রয়েছে। একজন সাহেবকে ছয় আনা অংশ দিয়ে, ঐ কাজ তাঁকে দিয়ে চালান হচ্ছে। বৎসর ত্রিশ হাজার টাকার উপর লাভ হয়। কর্ত্তার ইচ্ছে তোমাকে দিয়ে, সেই কাজ চালিয়ে নেন।

এতে ছয় আনা অংশ আর অপরকে দিতেও হবে না, কারবারও ভালরূপ চলবে। এতে তোমার কি মত ?"

ননীবাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন" যদি তাই হয় তবে আপত্তির কোনই কারণ থাকতে পারে না। চাকুরী ত ঠেকে কর্ম্ম হচ্ছে, ব্যবসায়ে দিকে আমার মন অনেক দিন হতেই আছে, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারিনি বলে চাকুরীতে আত্মনিয়োগ করেছি।"

উহার পর ননীবাবুর সহিত গৃহিণী সাংসারিক বিষয় লইয়া অনেক পরামর্শ করিলেন। শেষে ননীবাবু কাজের উছলায় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহ পরে, অসিতবাবু সপরিবারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ননীবাবু অসিতবাবুর

একান্ত অনুরোধে, পুরী যাইয়া, তাঁহারি বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রবিবার,— মণীবাবু পুরীর রাস্তায় রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, ঠাকুর বলদেব পাঁড়ে, মাথা ঝাঁকিয়া গান গাহিতেছে। পার্শ্বে ভৃত্য হরিদাস, গানের ভাবে বিভোর হইয়া, মুদ্রিত নেত্রে, ধীরে ধীরে হাত-তালি দিতেছে। বলদেব গাহিতেছিল :—

"কিয়া গোমানা করনা ?
আখের তো হোগা মরণা জী !
তুনভি যায়েগা, মৈ ভি যায়েগা,
যায়েগা মল্ মল্ খাসা জী !
লাখ্ রূপেয়াকো সুরত জায়েগা,
মাটিকা হউগা উড়্না জী !
কিয়া গোমানা করনা ?
আখের তো হোগা মরণাজী !
মাটিছে উড়্না, মাটিছে বিছানা,
মাটিছে— ছের খানা জী !

মাটিচে এ-দেহ্ বানায়ে,
মাটিমে মিল জানা জী !
কিয়া গোমানা করনা ?
আখের তো হো গা মরণাজী !"

ননীবাবু নিঃশব্দে, বারেন্দার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে ছিলেন। হঠাৎ বলদেবের দৃষ্টি ননী বাবুর প্রতি নিবদ্ধ হইতেই সে গান বন্ধ করিয়া দিল, এবং ব্যস্ততার সহিত বলিল "হরিদাস! বাবুজী আয়া।"

হরিদাস ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গামছা কাঁধে ফেলিয়া, রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে ধীরে ধীরে বারেন্দায় পা'চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, ননীবাবু নৈশ ভোজন শেষ করিয়া বারেন্দার এক খানা ইজি চেয়ারে পা ছড়াইয়া বসিলেন। সম্মুখে উন্মুক্ত সাগর গর্জ্জন করিতে ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,— কাল মেঘের ছায়া,

কাল জলে মিশিয়া, আরও ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ আলোক সাগর ঊর্ম্মি-গুলির উপর পড়িয়া, চিক্ চিক্ হাসিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রকলা, ভাসমান মেঘের স্তবকে, ক্ষীণ আলো বিস্তার করিয়া, থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যকে বিরাট রহস্যময় করিয়া তুলিতেছিল। উন্মত্ত তরঙ্গগুলি দ্রুত সঞ্চালিত বাতাসের সহিত গা ভাসাইয়া দিয়া, বেলা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে-ছিল এবং অশ্রান্ত মর্ম্মর ধ্বনী উৎপাদন করিতেছিল। ভৃত্য হরিদাস আহারান্তে জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া, ননীবাবুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ পার্শ্বের ভাড়াটে বড় বাড়ীটায় কে এসেছেন— বল্‌তে পার?"

হরিদাস নম্র স্বরে বলিল "কলিকাতা হ'তে এক জন ভদ্রলোক, সপরিবারে হাওয়া পরিবর্ত্তন কর্ত্তে এসেছেন। অবস্থা ভাল। গোটা বাড়ীটাই ভাড়া

করেছেন। ঠাকুর চাকর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।”

ননীবাবু ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন “নাম কি জান?” হরিদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল “না— খোঁজ করিনি। তবে তাঁদের চাকর এসে আপনার নাম জেনে নিয়ে গেছে।”

ঠিক এমনি সময়ে একটি লোক ননীবাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিল “বাবু! আমাদের কর্ত্তা আপনাকে ডেকেছেন।”

ননীবাবু চকিত নেত্রে সেই আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, সংযত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “কোথায় যেতে হবে?”

“ঐ যে সমুদ্রের ধারের বাসায় আলো জ্বলছে— ওখানে।”

“তোমার কর্ত্তার নাম কি?”

“আঁজ্ঞে— রমেশ বাবু। আপনারই শ্বশুর বলে শুনেছি।”

ননীবাবুর উদ্বেগ-ম্লান পাণ্ডুমুখ, আগন্তুকের উক্তিতে একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার

বুকের ভিতর পরস্পর বিরোধী চিন্তা বন্যা দু'কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিল। নানা আশঙ্কায় ননীবাবুর মনের ভিতর প্রবল উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। শেষে হরিদাসকে শয়ন কক্ষ পাহাড়া দিতে উপদেশ প্রদান করিয়া আগন্তুকের পশ্চাৎগামী হইলেন।

ননীবাবু প্রায় দুই তিন মিনিটের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর একটি প্রকাণ্ড কক্ষে যাইয়া উপনীত হইলেন। সম্মুখে রমেশ বাবু সস্ত্রীক বসিয়াছিলেন। ননীবাবু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

রমেশবাবু কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "আমরা তোমার খোঁজ না করেছি এমন স্থান খুব কমই আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তুমি যখন বেড়াতে যাচ্ছিলে,— তখন আমি জানালা দিয়ে তোমাকে দেখ্‌তে পাই। তারপর লোক পাঠিয়ে তোমার ঠাকুর চাকরের নিকট খোঁজ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

ননীবাবু কথার কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ-জনিত শোকের রুদ্ধ-অশ্রুরাশি, শ্বশুর মহাশয়ের সহজ ভাবের নিকট যেন অচলতার হাওয়ায় নিথর হইয়া গেল। শ্বশুর মহাশয়ের সমস্ত কথার অর্থ বোধ করিবার ক্ষমতা যেন তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। কন্যার মৃত্যুতে জনক জননী যে এত অটল,— এত স্থির থাকিতে পারে,— এরূপ ধারণা তিনি কোন দিনই করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত যেন ননীবাবুর নিকট একটা মস্ত প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ননীবাবু একটা আর্ত্ত শ্বাস মোচন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের তীব্র অগ্নিময় ঝটিকা, রমেশ বাবুর সহজ উক্তিতে এতটুকুনও প্রশমিত হইতে পারিল না। তাঁহার প্রতি কথাগুলি একটা দুর্ব্বোধ্য হেয়ালীর সৃষ্টি করিয়া, অশান্তির অনলে যেন ইন্ধনই যোগাইতে লাগিল। ননীবাবু নীরবে— নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

এই ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত না হইতেই,

নীহার দিদি ননীবাবুর নিকটে আসিয়া সহাস্য বদনে বলিল "বেশ তুমি লোক কিন্তু। আমরা তোমার জন্য খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, আর তুমি কিনা সাধু সেজে তীর্থ পর্য্যটণ করে বেড়াচ্ছ। তুমি যে এত সহজে,— শেষটায় এতবড় যোগী হয়ে দাঁড়াবে, তা'ত কোন দিনই ভেবে উঠ্‌তে পারিনি। আচ্ছা তা'র কৈফৎ পরে দিবে এখন। এখন আমার সঙ্গে এস দিকিন।"

ননীবাবু নিতান্ত নির্জ্জিব, দম দেওয়া কলের পুতুলের মত, স্খলিত ও জড়িত পদক্ষেপে নীহার দিদির অনুসরণ করিলেন। পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে উপনীত হইয়া, নীহার দিদি একগাল হাসিয়া, ননীবাবুকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

ননীবাবু সাগর সম্মুখে করিয়া, পার্শ্বের জানালায় দাঁড়াইয়া, নানা চিন্তায় আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ-সব কি ব্যাপার? একটা লোক কয় মাস হয় মারা গেল,—

আমি এসেছি, বাড়ীর কাউকেই চিন্তা-ম্লান দেখাচ্ছে না— শোক প্রকাশ করাত দূরের কথা! এর মানে কি ?”

—:():—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য ননীবাবু যখন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উপায় উদ্ভাবনের পন্থা আবিষ্কার করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন, ঠিক সেই সময়, ঊষা আসিয়া হাসিভরা স্নেহ-নেত্রে একটুকু মধুর দৃষ্টি আনিয়া, ননীবাবুর গলা জড়াইয়া, চাঁপা হাসির সহিত বলিল “বেশ্ মানুষ কিন্তু তুমি যা' হ'ক।”

অনেক দুঃখের পর মানুষ যখন হঠাৎ সুখের সাড়া পায়, তখন সহজে তাহার বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। এমন কি সেই সুখের উপাদানগুলিকে খাটী জিনিষ বলিয়া ধারণা করিতে অনেক সময়

দ্বিধা বোধ করে। উষাকে দেখিয়া ননীবাবুরও অনেকটা সেই অবস্থা দাঁড়াইল। ননীবাবুর হৃদয়ের শোণিত প্রবাহ যেন নিমিষে শিলা কঠিন শীতল ও নিশ্চল হইয়া গেল। তিনি উষার বাহু কবল হইতে আপনাকে জোরে মুক্ত করিয়া লইয়া,—দুই চারি পা পিছাইয়া আসিলেন, এবং সম্মুখের জানালাটাকে, দেহভার রক্ষার অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাষা হারা জিহ্বাকে ও শব্দোচ্চারণে অক্ষম প্রায় কণ্ঠকে অতি কষ্টে স্ববশে আনিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন "কে তুমি? ভূত-ভূত।

উষা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া ননীবাবুর মুখ দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া, জড়িত স্বরে বলিল "কি যে বলছ তার ঠিক নেই-ই। আমাকে চিনতে পাচ্ছ না? চেঁচানি শুনলে বাড়ীর লোক সব কি ভাববে?"

ননীবাবু স্তম্ভিত ভাবে ক্ষণকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে উষার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর বিষাদ ও আনন্দের দুই বিভিন্ন রেষ ঝঙ্কার

দিয়া উঠিল। ননীবাবু ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন "তুমি মরণি? বেঁচে আছ?"

ঊষা ননীবাবুর অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঝড়ের প্রবল ঝঞ্ঝার মত একটা তরঙ্গ তাহার বুকের মধ্যে আছাড়ি পাছাড়ি করিতে লাগিল। ঊষা গম্ভীর স্বরে বলিল "কে বল্ল্ আমি মরেছি? আমি মর্‌লে তুমি সুখী হতে— না?"

ননীবাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে ঊষার প্রতি তাকাইয়া, আহত-তন্ত্রী— বীণার আকস্মিক ক্রন্দন মুর্চ্ছনার ন্যায় ক্ষীণ স্বরে বলিলেন "তবে কে মিথ্যা "তার" করেছিল?"

গভীর দুঃখের আবেগে সারা মুখ বিবর্ণ করিয়া উদ্বেগস্পন্দিত--হৃদয়--আবেগে ঊষা বলিল "কৈ-- মিথ্যা তার ত কেউ করেনি! আমি মরেছি— এরূপ তার ত কেউ করেছে বলে জানি না।"

ননীবাবু উগ্র ব্যকুলতায় বলিয়া উঠিলেন "তারে লিখা ছিল **"Sad accident"** এটা মিথ্যা নয় কি?"

ঊষার মুখ সহসা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উগ্র আনন্দে

কি সঙ্কোচে, তাহা সে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, সংযত স্বরে বলিল "সেটা ঠিকই লিখা হয়েছিল। বৌদি' রেলগাড়ীর নীচে পড়ে মারা গিয়েছিলেন,—তাই জানান হয়ে ছিল।"

ননীবাবু বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে উষার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে উষার কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "কি হয়েছিল বল দিকিন ?"

জানালার ভিতর দিয়া শীতল বাতাস ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করা সত্ত্বেও ননীবাবুর ললাটে দুই এক বিন্দু ঘর্ম্ম জমিয়া উঠিয়াছিল। উষা বস্ত্রাঞ্চলে ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিয়া,— মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "সে কথা পরে হবে এখন!"

ননীবাবু স্বভাব সিদ্ধ ঔদাস্য ব্যঞ্জক নীরস স্বরে বলিলেন "কথাটা এখনই খুলে বল,—আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।"

উষা একটুকু মৃদুহাস্য করিয়া বলিল "তাওড়া

হ'তে গাড়ী গণ্ডিয়া এসে পৌঁছা মাত্র ষ্টেসন মাষ্টার গাড়ীর নিকট এসে আমার খোঁজ করলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর "জানানা" বিশ্রাম কামরায় গিয়ে বস্তে আমাকে উপদেশ দিলেন। তুমি প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে আস্ছ তা'ও জানিয়ে দিলেন। আমি তোমার প্রতীক্ষায় বিশ্রাম কামরায় খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে রইলুম। প্রায় এক ঘণ্টা পর জব্বলপুরের গাড়ী ষ্টেসনে এসে দাঁড়াল। আমি দেখ্‌লুম দাদা বৌদিকে নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসে আছেন। আমি দরজার নিকট এসে দাঁড়াতেই, দাদা গাড়ী হতে নেমে এসে, আমাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বল্‌লুম,— তুমি যে পরের গাড়ীতে আসছ তাও জানিয়ে দিলুম। দাদা সমস্ত শুনে, আমাকে কলিকাতা নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। এ-অবস্থায় একাকী থাকা নিরাপদ নয়ই— বলে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি আমাকে নিয়ে চলে এলেন। **Chhattisgarh** ষ্টেসনে মেল্ গাড়ীর সাথে "ক্রসিং" হবে শুনে, দাদা বৌদিকে

নিয়ে প্লেটফরমে বেড়াতে লাগলেন। আমাকেও যেতে বলে ছিলেন, আমি যাই নি। আমাদের গাড়ী 'মেইন' লাইনে দাঁড়ান ছিল। মেল্ আস্‌ছে দেখে, সকলের নিষেধ উপেক্ষা করেই, দাদা বৌদিকে নিয়ে ষ্টেসন লাইন পাড় হয়ে, আমাদের গাড়ীতে আস্‌ছিলেন। বৌদি হঠাৎ লাইনে পা ঠেকে পড়ে গেলেন। দাদা সামনের দিকে সামান্য এগিয়ে এসেছিলেন। ফিরে বৌদিকে তুল্‌বার পূর্ব্বেই, তুফানের মত বেগে, মেল্ বৌদির উপর দিয়ে চলে গেল। তারপর যা হবার তাই হল! আমরা শেষে পরদিন "শব" নিয়ে কলিকাতা চলে এ-লুম। কলিকাতা এসে সেই কথাই তোমাকে "তার" করে জানান হয়েছিল।"

ননীবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন "কৈ— 'তারে' বৌদির নাম গন্ধও উল্লেখ ছিল না। আমি তোমার বিপদ মনে করে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ছিলুম।"

ঊষা দৃঢ়স্বরে বলিল "সে সময় সকলের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা ধারণা করে নেও দিকিন?

কি লিখতে কি লিখেছে, তার কি হিসাব কেউ কত্তে পেরেছে। লিখার দোষেই এরূপ হয়েছে। তবে সকল বিষয় ভালরূপ জেনে এরূপ ধারণা করা তোমার খুবই উচিত ছিল।”

ননীবাবু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন “তোমার দাদা সপরিবারে কলিকাতা যাচ্ছিলেন, তা আমি ভাবতে পারিনি বলে, এতটা গোল হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গীয় স্ত্রীলোক গাড়ীর তলে পড়ে মারা গেছে—তাই খবরের কাগজে পড়েছিলুম। তারপর তারের লিখা **Sad accident** পড়ে তোমারি বিপদ ঘটেছে মনে করেছিলুম।”

ঊষা একগাল হাসিয়া বলিল “ব্যাপারটা দেখছি মন্দ গড়ায়নি! তুমি কলিকাতা গেলেই সব গোল মিটে যেত।”

ননীবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন “সেই ব্রাহ্মস্পর্শ দিন বেড়িয়ে ছিলুম, নীহার দিদির তাড়নার ভয়ে যেতে সাহসে কুলোয়নি।”

ঊষা স্মিত মুখে বলিল “সে-টা তোমার ভুল।

তোমার নিরুদ্দেশের পর হ'তে, দিদি একেবারে মুসড়ে পড়েছে। কেবলই বলত আমার ঠাট্টার ভয়েই এরূপ হয়েছে। কত দেবতাকে "মানত" করেছে তার ঠিক নেই। এবার অনেক দেবতাই পূজা পেয়ে যাবেন।"

ননীবাবু কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ যেন নানা চিন্তায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। ননীবাবু জীবনের উপর এত বড় ধাক্কা খাইয়া, এখন এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়েন - যাহার সহিত আর কোন অবস্থা দিয়াই তুলনা করিতে পারিতেছিলেন না। এই ঘটনায় সহসা তাঁহার জীবনের সমস্ত সংকল্প বদল হইয়া গেল। বরষার নদী গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে শুকাইয়া যেমন তাহার উভয় পারের ধূ-ধূ বালুকা রাশির মধ্যে মিলিয়া যায়,—ননীবাবুর কল্প প্লাবি আকাঙ্ক্ষা ও যেন অপ্রত্যাশিত ঘটনা চক্রের ঘাত প্রতিঘাতে, একেবারে শুষ্কতর হইয়া, জীবনকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিল।

ননীবাবু নিতান্ত হতভম্বের ন্যায় বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সম্মুখে সুবিস্তৃত অন্ধকাররাশি, সেই অন্ধকার যেন তাঁহার প্রাণের ভীষণ অন্ধকারের সহিত তাল মিলাইয়া, ছুটিবার জন্য যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল। খণ্ড খণ্ড মেঘের ওড়না আকাশের অঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া ছিল। তাহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, সূক্ষ্ম বসনান্তরালে সুন্দরীর অঙ্গ লাবণ্যবৎ অর্দ্ধ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। ননীবাবুর চিন্তা বিভিন্নমুখী। তাঁহার মনে পড়িল বিবাহের কথা,—শুভার কথা। সম্মুখস্থ অসীম সমুদ্রের তরঙ্গগুলি যেন তাহার বক্ষে আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া তাঁহাকে এক অসীমের দিকে ভাসাইয়া লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, এরূপ ননীবাবুর প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এই অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় মিলনে আজ ননীবাবুর অন্তর তৃপ্ত হইতে পারিল না। যেন এক অসীম বেদনা তাঁহার অন্তরে ফণায় পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে দংশনের জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল।

যে মিলনের জন্য তাঁহার এত আগ্রহ ছিল,—যাহাকে পাইবার জন্য তাহার চিত্ত এত অস্থির হইয়াছিল, আজ তাহাকে সম্মুখে পাইয়াও, ননীবাবুর হৃদয় যেন নূতন ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল!

ননীবাবু অতিকষ্টে আত্মস্থ হইয়া, বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, নীহারদিদি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। ননীবাবু সেই স্থানে নতমুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে, চোখের ভাবে খুনী আসামীর ভয়ানক প্রতিকৃতি স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

নীহার দিদি সহানুভূতি পূর্ণ চকিত নেত্র ননীবাবুর বিব্রত ও বিষন্ন মুখের উপর সংন্যস্ত করিয়া, স্মিত আস্যে বলিল "আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সকল "Play" দেখেছি ও শুনেছি। তুমি যে এত বড় প্রেমিক,—তা কখনও ধারণা কত্তে পারি নি। আজ তুমি কোথায়ও যেতে পারবে না। এই ঘরেই বিছানা রয়েছে,— এখানেই শুয়ে থাক। তোমার

ঐ বাসার ঘর পাহাড়া দেবার জন্য বাবা লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া নীহার দিদি বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া চলিয়া গেল।

ঊষা ধীরে ধীরে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া বিছানার এক পার্শ্বে আনিয়া বসাইল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ঘরের আলোর তেজ কমাইয়া দিয়া,— ঊষা স্বামীর গলা জড়াইয়া শয্যায় আশ্রয় লইল।

বাহিরে ঝড়ের প্রচণ্ড দমকা হাওয়া, বৃষ্টির উন্মত্ত চীৎকার, অশনির কড়্ কড়্ নিনাদ,— বাহিরে থাকিয়াই বিশ্ব প্রকৃতির কর্ণপট বিদীর্ণ করিতে লাগিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া অর্গলবদ্ধ দরজা ও জানালাগুলি লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ননীবাবু চা পান শেষ করিয়া, ভোর সাতটায় টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি

এই আকস্মিক, সপ্নাতীত পরিবর্ত্তনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া সহসা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত হইয়া পড়িলেন। সাধারণতঃ পৃথিবীটা অচলার মত অনুমান লইলেও ভূগোল পাঠে আমরা বিপরীত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু ননীবাবুর জীবন স্রোতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, কোন্ স্থানে এবং কখন যে কি ভাবে, গতি হারার মত হইয়াছিল, তাহা বাহিরের লক্ষণে, কিংবা অন্য কোন উপায়ে, উপলব্ধি করা নিতান্ত অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বেদনাতুর স্তব্ধ দৃষ্টির ভিতর, পাষাণ মূর্ত্তির মতই, অচল চাহনিটুকুন, তাঁহার জীবনের অসীম ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিতেছিল।

ননীবাবুর বুকের ভিতর, প্রবল রুদিতোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া কেবলই জানাইতে লাগিল "এখন উপায় কি? অসিত বাবু শুনে কি ভাববেন? শুভাই বা এই ঘটনার পরিণাম চিন্তা করে, আপনাকে কতটুকুন সংযত রাখ্‌তে সক্ষম হবে? আমার নির্দ্দোষীতা উপলব্ধি করে, শুভা আমাকে সমস্ত দায় হ'তে

মুক্তি দিতে ইচ্ছা করবে কি? এ-যে শুভার গোপন চিন্তার অতীত! এ-যে তাঁর ঘুমন্ত স্বপ্নেরও অগোচর, যা নিতান্ত অসম্ভবের মূর্ত্তি নিয়ে, তাকে পোড়াবার জন্য এক অসীম ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে! এ কি শুভা ধৈর্য্যের সহিত বুক পেতে নিতে সক্ষম হবে? এত বড় আঘাত সহ্য কত্তে সে কতটুকুন আত্মশক্তি প্রকাশ কত্তে চেষ্টা করবে?" যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ননীবাবুর অশ্রু ধোয়া চোখের পাতা আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সতেজ দেহ এই অভ্যন্তরিক উচ্ছ্বাসে একেবারে এলাইয়া শিথিল হইয়া পড়িল। তাঁহার চোখের সম্মুখে শুভার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। মনে পড়ল শুভার হর্ষ-মধুর অধরোষ্ঠ, অর্দ্ধ নিমিলীত স্মিত-দৃষ্টি, লজ্জায় আরক্তোজ্জ্বল গণ্ডস্থল, আর সেই সলাজ মন্দ হাস্য এবং স্নেহ জড়িত কথাগুলি। ননীবাবু অতি কষ্টে আত্মস্থ হইলেন। শেষে একখানা সুদীর্ঘ-'তার' লিখিয়া সমস্ত বিষয় অসিতবাবুকে জানাইয়া দিলেন।

সমুদ্রেরধারে বিশ্রামহীন, ভূতগ্রস্তের মত, উন্মনা

চিত্তে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া, ননীবাবু যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন বেলা এগারটা বাজিয়া ছিল। ঊষা এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে, বারেন্দার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, ননীবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিল। ঊষা ননীবাবুকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে শয়ন কক্ষের ভিতর লইয়া গেল এবং শরীরের সমস্ত পরিচ্ছদগুলি একে একে খুলিয়া ফেলিয়া দিল। শেষে এক খানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে উদ্বেগ মথিত কণ্ঠে বলিল "কোথা গেছিলে? রোদে ঘুরে ঘুরে দেখ দিকিন চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে!"

প্রশ্ন শুনিয়া ননীবাবুর অন্তরে, গভীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তৃষিত ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। ব্যাঘ্র ভয়ে ভীত লোক যেমন আপনাকে নিরাপদ স্থানে লুকাইত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, ননীবাবুর শূন্য দৃষ্টির মধ্যেও সেরূপ একটা আগ্রহ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ননীবাবু পাংশু ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া কি যেন বলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শব্দগুলি কণ্ঠের মধ্যেই অস্পষ্ট হইয়া মিলিয়া গেল।

ননীবাবু বিষাদ বিষণ্ণ চোখে সংশোকের জন্য উষার মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন "টেলিগ্রাফ আফিসে গেছিলুম। কলিকাতা এক বন্ধুর নিকট তার করে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিয়ে এলুম।"

উষা ননীবাবুর মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল "তা লিখে লোক দিয়ে পাঠালেই হ'ত, এই রোদে ঘুরে, দেখ দিকিন, মুখ খানা শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে।"

ননীবাবু উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া কি একটা প্রত্যুত্তর দিতে যাইতেছিলেন। তিনি যেন হঠাৎ অন্তর্জ্ঞান লাভ করিয়া, স্তব্ধ ও গতিহীন দৃষ্টি উষার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"কোন কাজ ত নেই একটুকুন হাঁটা ভাল, বসে বসে পঙ্গু হয়ে যাব যে। তাই নিজেই তার করে এলুম।"

কথা কয়টি বলিয়া ননীবাবু যেন মুহূর্ত্তে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গা অবসাদে, একেবারে, মুস্‌ড়িয়া পড়িলেন। প্রচণ্ড একটা আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ননীবাবু ধীরে ধীরে সমুদ্রে স্নান করিবার

জন্য, বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উষা সহাস্য বদনে ননীবাবুর হাত ধরিয়া বলিল "বসে কি থাকা পোষায় ? মস্ত কাজের লোক হয়েছ কিনা ? আজ বাসায়ই স্নান কর, বড্ড বেলা হয়ে গেছে, সমুদ্র স্নান আজ থাক্, কাল আমিও তোমার সাথে সমুদ্রে স্নান কত্তে যাব, বুঝলে ?" অতঃপর উষা ননীবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া স্নানের কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। ননীবাবু কয়েক মিনিটের ভিতরই স্নান শেষ করিয়া ফেলিলেন।

সন্ধ্যার অপরিস্ফুট অন্ধকারের ছায়ায়, শয়ন কক্ষের বাহিরে, ননীবাবু একাকী আরাম কেদারায় বসিয়াছিলেন। আকাশ ভরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগুলি, কালোর গায়ে আলো ছিট্‌কাইয়া, অতি ক্ষীণ রজতালোকের স্নিগ্ধ ধারা ছড়াইতেছিল। আকাশে, বাতাসে, কোনও সম্মোহন শক্তির উপাদান বিক্ষিপ্ত না থাকিলেও, ননীবাবুর চোখের পাতাগুলি এক অপূর্ব্ব নেশায়, জড়াইয়া আসিতেছিল। মনের ভিতর এক গ্লানী-বিধুর-সুর যেন অনাহূত ভাবে ঝঙ্কৃত

হইতে ছিল। ঠিক এমনি সময়ে, উষা পুলকের-দীপ্তির মত, ননীবাবুর স্কন্ধে হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিল "তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন—বল দিকিন? আমি সারা দিন ধরে লক্ষ্য কচ্ছি তুমি যেন এক নিগূঢ় চিন্তায় আপনাকে জড়িত করে এক তীব্র যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছ! মুখে কথা নেই কেবলি অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাব্‌ছ!"

উষার স্পর্শ ননীবাবুর স্বপ্ন-বিভোর আহত চিত্ত যেন সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাঁহার পুঞ্জীভূত অকথ্য বেদনা-পূর্ণ বক্ষ ঠেলিয়া এক মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-স্বর ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। উষার যৌবন সুলভ ক্ষিপ্রতা, কৌতুক পূর্ণ বাগ্মিতা, মন-ভুলান হাসি, এবং আকর্ষণী দৃষ্টি সমস্তই ননীবাবুর হৃদয় অধিকার করিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া উষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ভবিতব্যের অন্ধ যবনিকা ভেদ করিয়া, অসীম চিন্তার আঘাতে; ননী-

বাবুর জ্যোতিহীন আঁখি দুইটি, সজল হইয়া উঠিল। ননীবাবু কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না।

উন বিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊষা ননীবাবুর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতর সমবেদনার নিষ্প্রভ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়া প্রচণ্ড একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ঊষা আপনাকে সংযত করিয়া দুই হস্তে স্বামীর গলা জড়াইয়া, নম্রকণ্ঠে বলিল "এমন করে চেয়ে রইলে যে? কি হয়েছে আমাকে খুলেই বল না। আমার নিকট তোমার কিছুই গোপন থাক্‌তে পারে না। তুমি মনের দুশ্চিন্তায় আপনি আপনি অধীর হয়ে দিন কাটালে, তা'তে আমার শান্তি কোথায়? তোমার অশান্তির ভাগ আমায় দিতে না চাইলেও, আমি আগ্রহে মাথা

পেতে নিতে চাইবই। কিচ্ছু গোপন করো না। কি হয়েছে আমায় বল্‌বে না ?”

ননীবাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত বাক্য হারা হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে যেন ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন কাটিয়া গেল। ননীবাবু লজ্জায় স্তব্ধ মুখে ঊষার প্রতি বারেক তাকাইয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। শেষে দুই জানুর মধ্যে সেই ঢাকা মুখ লুকাইলেন। অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগ তিনি ঠেলিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া অশ্রুপ্রবাহ মুক্ত করিয়া দিলেন।

ঊষা ভীতি বিহ্বল চিত্তে স্বামীর মস্তক স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইয়া, বস্ত্রাঞ্চলে চোখের অশ্রুরাশি পুছিয়া ফেলিল। শেষে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিল “কি হয়েছে খুলে বল। প্রতিকারের অবশ্য চেষ্টা করবই।”

ননীবাবু মিনতি ভরা স্নেহ দৃষ্টিতে ঊষার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন “ঊষা! আমাকে ক্ষমা কর্‌বে ?”

কথা শুনিয়া ঊষার অনিশ্বাসিত বায়ু প্রবাহ যেন জমাট বাঁধিয়া তাহার ভিতর ও বাহিরে এক প্রলয় ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া দিল। তাহার বুকে যেন নিমেষে

বজ্রসূচি বিদ্ধ হইল এরূপ অনুমান করিল। ঊষা একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় থরথর কাঁপিতে লাগিল। সে অতি কষ্টে আত্মস্থ হইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল "তুমি এমন কি অন্যায় কত্তে পার, যার জন্য আমার নিকট ক্ষমা চাইতে পার? তোমার কোন কাজই অন্যায় ভেবে, বিচারক সেজে, ক্ষমা করবার মত সাহস আমি রাখি না। কি হয়েছে আগে বলই?

ননাবাবু দৃঢ় স্বরে বলিলেন "আমি একটা মস্ত ভুল কত্তে যাচ্ছিলুম শুনলে তুমি আমার উপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে, এটা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি।"

ঊষা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—"এখনও ত কর নি? তবে আবার এত চিন্তা কচ্ছ কেন? তুমি এমন কোন দোষ কত্তে পারবে না, যার জন্য আমি তোমার উপর সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলব।"

ননীবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন "শ্রদ্ধা হারাও আর যাই কর, সকল কথা তোমাকে

না বললে আমার মনে শান্তি ফিরে পাব-ই না। আমি তোমার উপর বড়ই অবিচার কত্তে যাচ্ছিলুম। ভগবান রক্ষা করেছেন।" বলিয়া ননীবাবু সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা উষার নিকট বিবৃত করিলেন।

উষা বর্ণনা শুনিয়া মনে মনে বিশেষভাবে উৎকণ্ঠা-চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার বক্ষ-শোণিত যেন কল্‌ কল্লোলে সম্মুখস্থ সাগর তরঙ্গের মতই নিমেষে উত্তাল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শিরা, উপশিরার ভিতর যেন সহস্র তাড়িৎ শিখা একত্রে ছুটাছুটি করিয়া, তাহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। উষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিল এবং সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করিল। শেষে ননীবাবুর হস্তদ্বয় স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া, ব্যাকুল মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে ননীবাবুর মুখের প্রতি পলক-হীন চক্ষুতে চাহিয়া রহিল। উষার কণ্ঠের নিকট অশ্রুবারি যেন পুঞ্জীভূত হইয়া, বাকশক্তি লোপ করিয়া দিল।

ননীবাবু উষার অপ্রত্যাশীত ভাব লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন "ঊষা! তুমি রাগ করলে? বল ক্ষমা করবে কিনা?"

ঊষা স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া, অধরে একটুকু শুষ্ক হাসি ফুটাইল এবং নম্র স্বরে বলিল "রাগ করব কেন? তোমার কি দোষ? পুরুষ মানুষ এক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা করে থাকে, তুমি তার বেশী কিছু করেছ বলে আমার মনে হয় না। আমি যদি এখানে এসে তোমার খোঁজ না কত্তুম তবে কি বিপদই না হত! সে কথা যাক্ এখন শুভার কথা ভেবে আমি কূল কিনারা দেখ্‌ছি না। হায়! ভগবানের কি অভিসম্পাত! সেই নির্দ্দোষী বালিকার পরিণাম ভেবে আমার মনে ভীষণ আতঙ্ক এসে দাঁড়িয়েছে।"

ননীবাবু ঊষার কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—পুরুষের মধ্যে যাহা পুরুষত্ব তার সবটুকুন পৌরষ নহে! এই নারীর স্নেহ, কোমলতা, সরলতা জগতের উপর যাহা প্রকৃত শান্তিপ্রদ বলে সকলের ধারণা, তার সবটুকুন পৌরস অপেক্ষা শক্তি মর্য্যাদায়

নিতান্ত হীন বলে, তাচ্ছিল্য ভাবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ননীবাবু ডাকিলেন "ঊষা!"

ঊষা মস্তক উত্তোলন করিয়া চক্ষের পতনোন্মুখ অশ্রুজল সংবরণ করিয়া, হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ বিদায় দিয়া, নূতন ভাবে স্বামীর প্রতি তাকাইয়া, ভয়ার্ত স্বরে বলিলেন "এখন এর উপায় কি?"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "এখন সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা যা কিছু করা যাবে। অসিতবাবু সে প্রকৃতির লোক নন-ই—তিনি আমাকে অপদস্থ করতে কখনও অগ্রসর হবেন বলে মনে হয় না। ভবিতব্যের উপর মানুষের হাত নেই! তিনি কি আমার অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করবেন না?"

ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল "একটা কথা আমাকে ঠিক করে বলবে? গোপন করবে না?"

ননীবাবু নম্র স্বরে বলিলেন "কি কথা—বল? তোমার নিকট কিছুই গোপন করব না, এটা তুমি

ঠিক জেনো।"

উষা ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি শুভাকে ভালবাস্‌তে?" কথার শেষ দিকটায় উষার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া অশ্রুর বাষ্পে জড়িত হইয়া উঠিল।

প্রশ্ন শুনিয়া ননীবাবু তাড়িতপৃষ্ঠের ন্যায় সহসা চমকিয়া উঠিলেন! তঁহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, অনেক চিন্তার পর, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র জড় করিয়া, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "বাস্‌তুম।"

উত্তর শুনিয়া উষার বুকের ভিতর এক সুগভীর অবসাদ অতর্কিতে আসিয়া দেখা দিল। নিমেষে যেন তাহার জীবনের কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিল। হর্ষ, শোক, নিরাশা, নিরুদ্যমতা একত্র মিলিত হইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য যেন দীপ্তমান হইয়া উঠিল। উষা ননীবাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল "খুব ভাল বাস্‌তে?"

ননীবাবু পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কিত ভাবে উত্তর করিল "হাঁ।"

প্রত্যুত্তর শুনিয়া উষার নেত্রদ্বয় পলকশূন্য, জ্বালাময় হইয়া গেল। সমস্ত শরীর যেন বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উষা অতি কষ্টে স্বীয় ভাব গোপন করিবার জন্য, অবস্থার বিরুদ্ধে আপনাকে পরিচালিত করিতে লাগিল। অতি কষ্টে নয়নের অশ্রুবারি সংবরণ করিয়া স্মিতমুখে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকাইতে চেষ্টা করিল। শেষে অসংবরণীয় উদ্বেগের আঘাতে নীরবে ননীবাবুর বক্ষে মস্তক লুকাইল।

ননীবাবু নির্ণিমেষ নয়নে উষার সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া বাহিরের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ঠিক এমনি সময়ে সমুদ্রের ধারে নির্জ্জনে বসিয়া কে যেন গান ধরিল—

আজি এ-সুখের নিশীথিনী মোর
হতাশে কাটিল সই,—
আকাশের চাঁদ, এসে দূরে গেল,

কালাচাঁদ এল কৈ ?
বৃথাই পড়েছি দেহের ভূষণ,
ফেলে দিব অবহেলে,
চোখের কাজল যত অঙ্গরাগ,
ধুইব নয়ন জলে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা আটটায়, ননীবাবু অসহ্য গুরুভার যন্ত্রণা বুকে করিয়া, লোহার সিঁক দিয়া আঁটা একটি জানালার সন্নিধানে উপবেশন করিয়া সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপি ভবিষ্যতের পানে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিলেন,— জীবনের সমস্ত অতীত ঘটনাগুলি, অন্তরে যেন এক :বৈচিত্র্য-ভরা স্বপ্নজালের মতই একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছে !

কঠোর ব্যঙ্গে তিনি আপনাকে উপহাস করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,— "ভগবান মঙ্গলময়, তাঁ'র মঙ্গল হস্তের সৃষ্টই এ-জগত! তবে তিনি আশা, নিরাশা, বিরহ, বেদনার সৃষ্টি করে, জগতের নর নারীর মর্ম্মন্তুদ হাহাকার জাগাবার আয়োজন কেন করেন? যারা বিশাল চিন্তার অনির্ব্বাণ-চিন্তানল বুকে জ্বালিয়ে, জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে, নিরাশার গম্ভীর-ব্যাথার আঘাতে যাদের বক্ষ-পঞ্জর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আজীবন যেই বেদনার অবসান কত্তে আশা কত্তে পারে না,— তারা কেন বেঁচে থাকবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ কত্তে কুণ্ঠাবোধ করে না? এই কেন-র উত্তর কে দিবে? এ-যে মানব শক্তির অচিন্তনীয় বিষয়! আমার এই অশান্তি হ'ল ইচ্ছাকৃত! উষাকে হারিয়ে অসহ্য ক্ষত জ্বালা বিস্মৃত হবার জন্য,— নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য, যে মাদকতাপূর্ণ বিহ্বল আশায় উন্মত্ত হয়ে ছিলুম,— সে যে নিমেষে বিলীন হয়ে গেছে! যে উষার অযাচিত প্রেম, বুকভরা

প্রীতি সহায় করে, জীবনে অসীম তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলুম, তাকে হারিয়ে, আবার ফিরিয়ে পেয়ে, আজ মনে যথেষ্ট অশান্তির কষাঘাত সহ্য কত্তে হচ্ছে! এর কারণও ত সেই শুভা। শুভা আমার কে? দুদিনের দেখা বৈ ত নয়! শুভা আমাকে ভালবাসে? ঊষাও ত ভালবাসে জীবন ভরে ভালবাস্‌বে। প্রথম জীবনে, অন্তরের চারিধারে—উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়ে,—সেই ঊষাই যে আমার জীবন আলো করেছিল! ঝড়ের প্রবল হাওয়ায় দোলায়মান জীবন পুষ্পটিকে,— আবার বাজারে বেসাতি করতে গেলে ঊষার উপর যে ভয়ানক অবিচার হবে! সেই নির্ম্মল প্রাণটাকে পথের ভিড়ে ফেলে, ধূলা মেখে, নূতন করে গড়তে গেলে,—নিতান্তই খাপছাড়া হয়ে দাঁড়াবে! যে পথে অগ্রসর হ'তে চাচ্ছিলুম, সে পথ সুধুই যে মোহ জড়িত, আলেয়া ছাড়া কিছুই নয়! না— শুভার কথা আর মনেও স্থান দোব না, শুভা আমার কে? ননীবাবু শুভার স্মৃতি যতই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে

লাগিলেন, ততই গভীরতর চিন্তার আড়ালে, জাগিতে লাগিল—শুভা— শুভা আর শুভার ছবি খানি!

মনীবাবু তাঁহার স্বভাব বহির্ভূত অসহিষ্ণু ও উত্তেজনায় আপনাকে জড়িত করিয়া নানা চিন্তায় যখন আত্ম নিয়োগ করিলেন, ঠিক সেই সময়, তাঁহার চিন্তা স্রোতে বাঁধা দিয়া নীহার দিদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বসে বসে কি ভাব্‌ছ জামাই বাবু!"

মনীবাবু সহসা থতমত খাইয়া গেলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া বলিলেন "বিশেষ কিছু নয় এই সমুদ্রের তরঙ্গ-গুলির নর্ত্তন দেখ্‌ছিলুম!"

নীহার বালা সহাস্য বদনে বলিল "দেখ যেন আবার কবি হ'য়ে পড় না। পিছনদিকে মিল দিয়ে চৌদ্দ অক্ষর ঠিক রেখে যা' লিখবে, তাই কবিতা। আর তা'র লেখক হবেন কবি! এ অবস্থায় পড়ে অনেকেই বাবৃড়ি চুল রেখে, ঢোলা পাঞ্জাবি গায় দিয়ে কবি হয়ে নির্জ্জন স্থানে বসে বসে, কাগজ পেন্‌ছিলের সদ্ব্যবহার করে কিনা,— তাই

ভয় হচ্ছে।”

“না— সে সব কিছু আমার ভিতর সাড়া দিবার আশঙ্কা নেই বলেই মনে হয়।”

নীহার দিদি সহাস্য বদনে বলিলেন “জীবন সমুদ্রে তরঙ্গগুলি যে নর্ত্তন কচ্ছে এটা অস্বীকার করা চলেই না।”

ননীবাবুর অন্তর ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিরাশার কালো কালি তাহার মুখে যেন কে নিমিষে লেপন করিয়া দিল। ননীবাবু অতি কষ্টে অন্তরের সমস্ত আঘাত সংযত করিয়া বলিলেন “সে আবার কি ?”

নীহার দিদি তীব্র স্বরে বলিলেন “তা আর বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছ না ? একেবারে ন্যাকা সাজা আর কি!”

ননীবাবু স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় বিস্মিত মৃদুস্বরে বলিলেন “তা যাই হক— এই বিষয়টা যাতে আর বেশীদূর না গড়ায় তারই উপায় চিন্তা কচ্ছিলুম।”

ননীবাবুর মুখে সুগভীর ব্যাথা এমন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল যে, নীহার দিদি তাহা বিশেষ লক্ষ্য

করিল এবং দৃঢ় স্বরে বলিল "এ ছাড়া আরও অনেক কিছু ভাবছিলে! আমি যে গনৎকার, মুখ দেখে সব বলে দিতে পারি। তুমি কি ভাবছিলে ঠিক বলে দোব?"

ননীবাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "আপনারা যে মুখ দেখেই সব বুঝে নিতে পারেন তা' আর কারো অজানা নেই। আপনাদের ভাব, নীরবতার ভিতর যে অধিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা অনেক বড় বড় লেখক, কত ভাষায় ফুটিয়ে তুলে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। ঐ অপনাদের অসীম শক্তি নিয়ে কত কাব্য, কত গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে তার হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তবে আপনি যা বল্‌বেন তা সবই মিথ্যে হবে,— আমি তা আগেই বলে রাখ্‌ছি।"

নীহার বালা হাসিয়া বলিলেন "কি বলব তা না শুনে, সব বুঝতে পার বল্লেইত,—ভয়ে মক্কেল জুট্‌তে চায়নি। তুমি যে একে বারে এক তরফা হুকুম দিতে চাচ্ছ, কি বল্‌ব তা শুনেই নেও

না কেন ?"

ননীবাবু মস্তক নত করিয়া বলিলেন "তা শুনে ফল নেই-ই। যা মিথ্যা, তা শুনে কেবল মন খারাপ বৈত নয়।"

নীহার দিদি স্মিত মুখে বলিলেন "বিয়েটা ফস্কে গেল বলে তুমি মুস্‌ড়ে পড়নি ?"

ননীবাবু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন "না—তবে—।"

নীহার দিদি কথায় বাধা দিয়া বলিল "থাক্ আর কিছু বলে দরকার নেই। আমি যে মনের কথা বল্‌তে পারি তা ত বুঝলে ?" যাক্ সে কথা—অসিতবাবু এসেছেন, ঐ বারান্দায় বসে বাবার সাথে কথা কচ্ছেন। তোমাকে দেখা কত্তে বলেছেন।"

অসিতবাবুর নাম শুনিয়া ননীবাবুর মুখে একেবারে চিন্তা-ম্লান পাণ্ডু-আভা ধারণ করিল। তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, নীহারদিদি কি বলিতেছেন,—এবং এই কথার ভিতর কতটা সত্য

নিহিত রহিয়াছে। ভয়ে ত্রস্তের মত জ্বালা ভরা ত্বরিত কণ্ঠে, ননীবাবু বলিলেন "কখন এসেছেন ?"

নীহার দিদি দৃঢ়স্বরে বলিলেন "এই ঘণ্টা খানেক হ'ল। তা তুমি এত উতালা হচ্ছ কেন ? পুরুষ মানুষ, এমন কি-ই করেছ যে বড় বিপদ আশঙ্কায় আপনাকে বিব্রত করে তুলেছ ?"

ননীবাবু নীহার দিদির মুখের প্রতি তাকাইয়া বিস্ময় কৌতুহল ভরা স্বরে বলিলেন "শুনে কি বল্‌লেন ?"

কথা শুনিয়া নীহার দিদি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। শেষে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিল "বল্‌বে কি হাতী না ঘোড়া ? তাঁদের এক মাত্র মেয়ে ত আর জলে ভেসে আসেনি,— যে সতীনের ঘর কত্তে দিবার জন্য তোমাকে চেঁপে ধরবে!"

ননীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, নীহার দিদির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্ত আড়ষ্ট অভিভূতবৎ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন "আমি না গেলে

হয় না ?"

প্রত্যুত্তরে নীহার দিদি বিস্ময়াভিভূত স্বরে বলিল "বেশ তুমি পুরুষ মানুষ কিন্তু। এর জন্য একটা ঘোমটা দিয়ে ঘরে বসে থাক্‌তে চাও নাকি ? যদি দেখা না কর, তবে তিনি কি ভাব্‌বেন ? যদি না যাও— তবে একটা মস্ত অভদ্রতার কাজ হবে। এস— ভদ্রলোক অনেক্ষণ ধরে বসে রয়েছেন।"

মনীবাবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সূত্র পরিচালিত পুত্তলিকাবৎ ধীরপদবিক্ষেপে অসিত বাবুর নিকট আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অসিতবাবু মনীবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, বসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন "তোমাকে ত বড্ড রোগা দেখাচ্ছে। কোন অসুখ হয়েছে নাকি ?"

রমেশবাবু হুকাটি ধীরে ধীরে অসিতবাবুর হস্তে তুলিয়া দিয়া, মৃদু স্বরে বলিলেন "হ্যাঁ, শরীরটা ওর বিশেষ ভাল নেই। ডাক্তার দেখাব বলে মনে কচ্চি।"

অসিতবাবু ননীবাবুর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "তোমার ছুটী কবে ফুরাবে?"

ননীবাবু নম্র স্বরে বলিলেন "আরও এগার দিন বাকী রয়েছে।" অসিতবাবু রমেশবাবুর প্রতি মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "এ অবস্থায় কাজে হাজীর হওয়া ঠিক হবে না। বিশেষতঃ যে হাড়ভাঙ্গা চাকুরী।"

রমেশবাবু উদ্বেগ আগ্রহে বলিলেন "আমারও সেই মত। এ অবস্থায় কিছুতেই কাজে হাজীর হতে দোব না— মনে করেছি।"

অসিতবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "দেখুন রমেশ বাবু! ননীকে আমি ছেলের মতই ভালবেসেছি কন্যা বিয়ে দিবার জন্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়ে ছিলুম। প্রকৃত ব্যাপার সময়ে

প্রকাশ হয়ে পড়াতে, খুবই একটা বিপদ কেটে গেল। নির্দোষী কয়েকটি জীবন রক্ষা পেল। এখন শুভার বিয়ে অন্যত্র দিলেই হবে। এতে কোনই গোলযোগের কারণ নেই। ননীকে আর চাকুরীতে ফিরে পাঠাতে ইচ্ছা করি না। যদি আপনার মত হয়, বাবাজী আমার আসানসোলের কয়লার খনির ম্যানেজার হয়ে থাকতে পারে। আমি প্রতিমাসে দুইশত টাকা মাহিনা দোব। লাভের এক চতুর্থাংশও একে দোব বলে মনে করেছি। বাবাজী খেটেখুটে কারবার দেখলে ভালই হবে মনে করি।”

রমেশবাবু স্মিতমুখে বলিলেন “সে ত খুবই ভাল ব্যবস্থা। যদি ননীর কোন আপত্তি না থাকে, তবে এতে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে।”

অসিতবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন “ওখানে আমার একটা বড় বাড়ী রয়েছে। ম্যানেজারের জন্যও ভাল বাসা প্রস্তুত করে দিয়েছি। ননী ঊষাকে নিয়ে আমার বাসায়ও থাকতে পারে। ইচ্ছা করলে ম্যানেজারের জন্য যে বাসা তৈরী করে

দিয়েছি তাতেও থাক্‌তে পারে। আমার বাসায় যায়গা যথেষ্ট রয়েছে, কোন কষ্ট হবে বলে মনে হয় না।"

রমেশবাবু ননীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমার কি মত ননি!" ননীবাবু বজ্র গম্ভীরভাবে, নির্ব্বাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া রহিলেন। জিহ্বা যেন তাঁহার মুখের ভিতর আটিয়া গিয়াছিল। ঠোঁটের ভিতর দিয়া একটি কথাও যেন বাহির হইতে চাহিতে ছিল না। ভাষা যেন তাঁহার কণ্ঠহারা হইয়া, তাঁহাকে মূকে পরিণত করিবার আয়োজন করিতে-ছিল। ননীবাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অসিত বাবু সুধু ধনী নহেন, সুধু বিদ্বান নহেন— তিনি যেন নররূপে দেবতার স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহারি মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যে অসিত বাবুর ভয়ে আমি মিথ্যা আশঙ্কায় জড়িত হইয়া, আপনাকে অশান্তি অনলে দগ্ধ করিতে ছিলাম; তাঁহার অপ্রত্যাশিত দানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমি কতটুকুন সক্ষম হইব, তাহা নিতান্তই চিন্তার

বিষয়! ননীবাবুর রক্তহীন পাংশুমুখ সহসা অরুণবর্ণ ধারণ করিল। ননীবাবু বক্ষের দ্রুতস্পন্দন অতি কষ্টে রোধ করিয়া, অসিতবাবুর প্রতি মুখ ফিরাইলেন, এবং কম্পিত স্বরে বলিলেন "আপনার স্নেহ, যত্ন আমি জীবনে ভুল্‌তে পারব না। আপনার অমূল্য দানের ঋণ এজীবনে শোধ কত্তেও সক্ষম হব না। আপনি যাহা আদেশ করবেন তাহাই আমি প্রতি-পালন কত্তে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাক্‌ব।"

অসিতবাবু দৃঢ় স্বরে বলিলেন "তুমি আমার কয়লার কারবারের কথা পূর্ব্বেই শুনেছ। সাহেবকে বিদায় দিয়ে তোমাকে সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করলে সব দিকেই সুবিধা হবে। এ-কাজ দাসত্ব বলে ধারণা করলেও অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ কত্তে পারবে। হুকুমের হাত এড়ায়ে লোক অনবরত পরিশ্রম করলেও সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। প্রাণের তৃপ্তি কখনও হারিয়ে ফেল্‌তে পারে না। কাজ কম হলেও, হুকুমের তাবেদারী কত্তে হলে,—অসংবরণীয় একটা যন্ত্রণা যেন বুকের ভিতরে

অনবরত কষাঘাত করতে থাকে। আপনার কাজ মনে করে শত পরিশ্রমেও একটা স্ফূর্ত্তি ফুটিয়ে তোলে, মন প্রফুল্ল করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের স্বাস্থ্যও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। আমি এক সপ্তাহ পরে, সপরিবারে আসানসোল যাব। উষাও তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব মনে করেছি। তোমাকে কিছুদিন কাজ কর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে পরে আমি কলিকাতা ফিরে যাব।"

ননীবাবু সমস্ত শুনিলেন এবং মস্তক নাড়িয়া প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অসিতবাবু ননীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি চাকুরীটা একেবারে ছেড়ে দিও না। এখানকার সিভিল সার্জ্জনের সাথে আমার বিশেষ জানা শুনা রয়েছে। আমি চিঠি দিচ্ছি! তুমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ ছয় মাসের ছুটির দরখাস্ত কর। নূতন কাজে মন বসলে চাকুরী যখন ইচ্ছা ছেড়ে দিতে পারবে।"

রমেশবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "এই চাকুরীতে ফিরে যেতে দিতে আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই। উপরওয়ালাদের ব্যবহারের কথা শুনে মন একেবারে দমে গেছে। আমর মনে হয়, ওপরওয়ালাগণ যেন "দা" "কুড়ুল" হাতে করেই, অধীনস্থগণের উপর জুলুমের সুযোগ রাত দিন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এতে কাজও ভাল হয় না, কর্ম্মীদের মনের শান্তিও নষ্ট করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জীবনী শক্তি অনেক কমে যায়।"

অসিতবাবু দৃঢ় স্বরে বলিলেন "অনেকটা তাই বটে, চাকুরী একেবারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক মনে করি না। ছুটীতে থাকলে, এই কয়মাসের মাহিনা বাবদ কিছু ঘরে আসবেই।"

শেষে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই পরামর্শই স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হইল। অসিতবাবু ননীবাবুকে, তাঁহার বাসায় যাইতে উপদেশ দিয়া, ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষে নিদ্রোত্থিত হইয়া, ননীবাবু হাতমুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং উষার অনুরোধে, অসিতবাবুর বাসায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উষা ম্লান হাসি হাসিয়া, ননীবাবুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল "দিদির কাল রাত্রিতে সামান্য জ্বর হয়েছে— বাবা নীহার দিদিকে তাই আমাদের সাথে যেতে নিষেধ করেছেন। এস আমরাই যাই।"

ননীবাবু চিন্তা ম্লান মুখে গবাক্ষের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, নিরুদ্যম বিচ্ছুরিত চক্ষু উষার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন "থাক্—এখন নাই বা গেলুম, বিকালে গেলেই হবে এখন, কি বল?"

উষা চকিত হরিণী চঞ্চল কালো চোখের সমস্ত বিস্ময়-লেখা পরিস্ফুট দৃষ্টিতে বিন্যস্ত করিয়া বলিল "তা হবে না,—তাঁরা কাল বিশেষ করে বলে পাঠিয়েছেন,—না গেলে অসন্তুষ্ট হবেন। সমুদ্রের

ধার দিয়ে যাওয়া যাক, সূর্য্যোদয় দেখে শেষে যাব এখন। আজ পূর্ব্বদিক বেশ্ পরিষ্কার,—এমন সুন্দর প্রভাত সব দিন ঘটে উঠে না। সূর্য্যদেবের সাগর জলের সহিত নৃত্য দেখ্‌লে, তোমার মন নিশ্চয়ই প্রফুল্ল হবে এটা আমি ঠিক বলে দিতে পারি। চল— এখনই বেড় হয়ে পড়ি।” বলিয়া উষা স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সমুদ্রের উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিল।

সমুদ্রের উপকূলে আজ বহু নর নারীর সমাগম হইয়াছে। উষাও সূর্য্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী আলোক ও আঁধারের সংমিশ্রণ দেখিতে দেখিতে অনেকেই ভাবোন্মেষে তন্ময় হইয়া সুদূরের সীমা রেখার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। সুদূরে সমুদ্রের ঈষৎ আবিল জলরাশি বৃহৎ তরঙ্গ তুলিয়া, প্রচণ্ড আস্ফালন করিয়া, ঘোর গর্জ্জনে সূর্য্যদেবকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেন প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যদেব একটা সুবর্ণ কলসীর মত, জলের ঢেউএর সহিত নাচিতে নাচিতে আকাশের গায় ভাসিয়া উঠিতে

ছিলেন। উষা ননীবাবুকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যদেবের অর্দ্ধ উদ্ভাসিত তরুণ করুণ সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া, সহাস্য মুখে উষা ননীবাবুকে বলিল "দেখ দেখি কেমন দেখাচ্ছে! এ দেখতে তোমার ইচ্ছা করে না? যতই দেখি আমার কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি আসে না।"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং মুখে বলিলেন "আমি সূর্য্যোদয় অবশ্য অনেকদিন দেখেছি, আজ আকাশ খুবই পরিষ্কার কিনা,— তাই আজকার দৃশ্যটা খুবই প্রাণ মাতানো বলে মনে হচ্ছে! বিশেষতঃ দু'জনে একত্র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর কোন দিন—," কথা বলিতে বলিতে ননীবাবু থামিয়া গেলেন। কর্ণে এক তরুণীর মিষ্টস্বর লহরী শ্রবণ করিয়া, ননীবাবু সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, দৃষ্টি ঘুরাইতেই দেখিলেন,— অদূরে অসিতবাবু সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শুভ্রা নিকটে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য

গণনা করিয়া,—পিতা মাতার চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত শুভার মুখভঙ্গী ও অঙ্গ চালনার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পর মুহূর্তে শুভার সহিত ননীবাবুর দৃষ্টি বিনিময় হইল,—এবং তাহার সমুজ্জ্বল স্থির দৃষ্টির আঘাতে ননীবাবু অতিষ্ঠ হইয়া দৃষ্টি নত করিলেন। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত আড়ষ্ট অভিভূতবৎ থাকিয়া, লজ্জা জড়িত সঙ্কোচে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঊষার মুখের প্রতি তাকাইলেন। একটা অসীম অবসাদে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন মুস্‌ড়িয়া পড়িল। তিনি অতি কষ্টে আত্মগোপন করিয়া—সমুদ্র ও আকাশের মিলন সীমায় নবোদিত সূর্য্যের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

ঊষা ননীবাবুর আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভীতি জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলে যে? কি হয়েছে—বলবে না?"

ননীবাবু নত দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া মৃদু

অথচ পরিষ্কার স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন "এমনি—কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি কি না—তাই মাথাটা যেন কেমন করে উঠেছিল।"

ঊষা স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিল না। তাহার চিত্তে কেমন একটা গ্লানির মতই কি একটা জিনিষ, তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ঊষা বিস্ময় চকিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া— উত্তর করিল "তা-নয়, তুমিত রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়ে ছিলে, আমি বসে বসে বাতাস করেছি, কৈ তাও তুমি জানতে পার নি? না— গো— তা নয়ই,— এর ভিতর আরও কিছু রয়েছে, আমাকে বল্‌বেনা— না?"

ঊষার কথায় নলীবাবুর মনের ভিতর চমকিয়া উঠিল, তিনি কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। নলীবাবু বিস্ময় বিহ্বলবৎ হাঁ করিয়া ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমনি সময়ে শুভা ত্বরিত পদে আসিয়া ঊষার গলা জড়াইয়া বলিল "ঊষা দি! কেমন আছ? আমাকে চিনতে পার? আমি তোমারি

বোন।”

উষা শুভার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল— আমি ত একে আর কোথায় দেখেছি বলে মনে হয় না— এ—কে?

শুভা উষার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, একগাল হাসিয়া বলিল “আমি খুবই অপরিচিতা— নয় উষা দি? আমার নাম শুভা।” অতঃপর ননীবাবুর মুখের উপর দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল “উষা দিদিকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি,— বাবা মা নিয়ে যেতে বলেছেন— ঐ তাঁরা ওখানে। আপনি নিজেও আমাদের বাসায় যান নি—দিদিকেও যেতে দিন নি,—তা দিবেন কেন? আমরা যে পর।” বলিয়া শুভা উষার হস্ত ধারণ করিয়া অসিতবাবু যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন— সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

উষা শুভাকে চিনিতে পারিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল “আহা! শুভা বেশ্‌ মেয়েটি। কেমন সরল— হাস্যময়ী। আমি মনে মনে এর

প্রতি কতই না ঘৃণা পোষণ করেছিলুম,—ছিঃ—এর উপর সেরূপ ভাব পোষণ করা কি মানুষের শোভায় ?

—*—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভা চলিয়া গেলে ননীবাবু নীরবে বসিয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। শুভার কথা কয়টির ভিতর, পরস্পর বিরোধী চিন্তার কোনই কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইলেন না। ননীবাবু দেখিলেন শুভার মূর্ত্তিতে ত্রস্ত, ভীত, কুণ্ঠিত কোন ভাব নাই, কোথায়ও শঙ্কা দ্বিধা নাই, সে যেন আপন অধিকার বলে, অভিমানের ভাব দেখাইয়া, আজ যেন দৃঢ়পদে, স্মিত মুখে, ঊষাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সম্ভাষণের অপেক্ষাও করিল না। সেই অভাবনীয়

ঘটনায় ননীবাবু এতদিন বৈচিত্র্য ভরা স্বপ্নজালের মতই একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি করিয়া আপনাকে মসগুল করিয়া রাখিয়াছিলেন,—আজ যেন শুভার সেই সহজ, সরল ব্যবহারে, মনের সমস্ত দ্বিধা মুছিয়া দিয়া, আরও স্ফুটতর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঊষার অনিন্দ্য জ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানাকে আড়াল করিয়া, ননীবাবুর অন্তরে শুভার মূর্ত্তি আরও সুস্পষ্ট ভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। ননীবাবু তড়িতাহতের মতই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—শুভা ত বেশ সহজ ভাবে জীবন যাপন কচ্ছে, তার কথায় কোনই অশান্তির ভাব পরিস্ফুট হচ্ছে না! তা'র মনের গোপন কোণে, একটা বিশাল পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে,—এই ঘটনায় সে যে অসুখী হয়েছে, তা তার ভাব দেখে ত বোধ হচ্ছে না! তবে আমি কেন একটা আগুন বুকে করে, জ্বলে পুড়ে মরছি! একটা মিথ্যা আশার কুহকে পড়ে, আপনাকে বিব্রত করে তুলেছি!

ননীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল— শুভার পশ্চাৎগামী হন, কিন্তু তাঁহার পা যেন চলিতে চাহিতে ছিল না। একটা অবসাদ আসিয়া তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল,—ননীবাবু এরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন। ননীবাবু আবার বিষাদ ক্লিষ্ট মুখে প্রস্তর খণ্ডের উপর নীরবে বসিয়া রহিলেন।

শুভা উষাকে লইয়া, জননীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং উষার হাত জননীর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল,— "আজ জোর করেই ধরে নিয়ে এসেছি,—কি বল উষা দি' ?"

উষা একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "আমরা আপনাদের বাসায়ই আস্‌ছিলুম,— পথে সূর্য্যোদয় দেখবার লোভ সংবরণ কত্তে পারিনি বলেই, একটুকুন দেরী হয়ে গেছে।"

গৃহিণী উষাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "তা বেশ করেছ, তোমাদের আস্‌তে দেরী দেখে, আমরাও সূর্য্যোদয় দেখতে এসেছি।" অতঃপর

শুভার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিলেন "শুভা! ননীকে ওখানে একা ফেলে এলি কেন? বেচারা একা বসে কত কি না ভাবছে ;— যা তুই ননীকে নিয়ে বাসায় আয়, আমি ততক্ষণ উষাকে নিয়ে বাসায় যাচ্ছি।" অতঃপর গৃহিনী অসিতবাবু ও উষাকে সঙ্গে করে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল শেষে ধীর পদবিক্ষেপে ননীবাবুর পার্শ্বে আসিয়া নম্রস্বরে বলিল "চুরি অপরাধে— আপনি হয়ত আমার উপর খুবই রাগ করেছেন—না?"

ননীবাবু শুভার কথায় থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন এবং শুভার দৃষ্টি ও কোমলতার লজ্জিত আবেশে সিঁদূরের মত রাঙ্গিয়া উঠিলেন। শেষে একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন "চুরি? সে আবার কি?"

শুভা স্মিতমুখে বলিল "বুঝ্‌তে পারেন নি? উষা দিদিকে চুরির করে নেওয়ার কথা বল্‌ছি। কারো বিনা অনুমতিতে, কোন কিছু জোর করে নিলেই চুরি করা হয়— বুঝ্‌লেন?"

ননীবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন "এই কথা? তা তোমার উপর কখনও রাগ করেছি কি?

শুভা দৃঢ়স্বরে বলিল "কখন করেন নি,—এখনত করতে পারেন!"

ননীবাবু শুভার মুখের উপর অপলক দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন "কেন একথা বলছ শুভা?"

শুভা ননীবাবুর চোখের দিকে চাহিয়াই মাথা নীচু করিল এবং কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "এটা বুঝতে পারেন না? এ হতেই পারে না!" শুভার কথার শেষের দিকটার স্বর নিতান্ত ভারি হইয়া গেল।

ননীবাবু শুভার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিলেন, শুভার মুখে চোখে কেমন একটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতার ছায়া বিচ্ছুরিত হইতে ছিল,—তাহার বুকের অজস্র কামনা বাসনা যেন একটা অতৃপ্তির নাড়া লইয়া প্রতি কথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল।

ননীবাবু ধীরে ধীরে শুভার আরও নিকটে

আসিয়া বলিলেন "শুভা এ যে ভগবানের বিধান,—মানুষের কি হাত !"

শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত অপলক দৃষ্টিতে ননীবাবুর প্রতি তাকাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিল। শেষে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল "মা—আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন,—আমাদের বাসায় যাবেন না ?"

ননীবাবু তড়িতাহতের মত চমকিয়া, বাষ্প জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "যাব না কেন ? তবে মনে সেরূপ শান্তি নেই বলে, এ দু'দিন যেতে পারি নি। তজ্জন্য তুমি রাগ করেছ,—নয় শুভা !"

শুভা একটুকুন তাচ্ছাল্যের ভাব দেখাইয়া বলিল "আমার রাগে আপনার কি ক্ষতি হ'তে পারে ? কয়দিন রোজই আপনার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছি ;—কাল আপনাদের বাসায় যেতে চেয়ে ছিলুম,—সাহসে কুলোয় নি, আজ যখন আপনাকে দেখতে পেলুম, তখন আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। আপনাকে কাছে পেয়ে,

মনের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ কত্তে লাগলুম। তাই উষা দিদিকে নিয়েই চলে গেলুম। তা চলুন আমাদের বাসায়,—মা খুবই ব্যস্ত হয়ে আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছেন।”

ননীবাবু আর কোনই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে শুভার পশ্চাৎগামী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

উভয়ে অসিতবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিতেই, গৃহিণী ননীবাবুর হাত ধরিয়া একটি চেয়ারে বসাইলেন এবং মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন “ননি! এতদিন তুমি আমাদের বাসায় আসনি কেন? তুমি যে ঘরের ছেলে। এ কি কখনও পর হতে পারে—বিশেষতঃ আমার ছেলে নেই—তুমি যে সে স্থান অধিকার করেছ। উষাকে নিয়ে

আসানসোল চল,—বেশ্ একসঙ্গে থাকা যাবে এখন। ঊষা খুবই লক্ষ্মী মেয়ে,—এই সামান্য দেখাতেই আপন করে নিয়েছে।"

জননীর কথায় কৃত্রিম মুখ ভার করিয়া শুভা বলিল "ঊষা দি' হল গিয়ে লক্ষ্মী,—আর আমি বুঝি হলুম অলক্ষ্মী,—নয় ?" বলিয়া শুভা ঊষার গলা জড়াইয়া বলিল "কি বল ঊষা দি' ?"

ঊষা হাসিতে হাসিতে শুভার মস্তক বক্ষে টানিয়া লইল।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন "পাগলী মেয়ে, আমি কি তাই বল্‌ছি ? তুমিও খুব লক্ষ্মী,—এখন হল ?"

এমনি সময়ে অসিতবাবু মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন "বেশ্—এখন আমাদের জল খাবার এনে দাও,—আমি ঊষাকে সঙ্গে করে খাব এখন।"

গৃহিণীর আদেশে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঠাকুর, দুইখানা রেকাবে করিয়া, নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য আনিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল। অসিতবাবু ঊষাকে

সঙ্গে করিয়া জলযোগে মনোনিবেশ করিলেন। ননীবাবু পার্শ্বে বসিয়া থাকার দরুণ, উষাকে শঙ্কোচিতা দেখিয়া, অসিতবাবু পাশের কামরায় ননীবাবুর জল যোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

ননীবাবু অসিতবাবুর প্রস্তাবে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, পার্শ্বের কামরায় একখানা চেয়ারে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শুভা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে রেকাবখানি ননীবাবুর সম্মুখের টেবিলে সংরক্ষণ করিয়া,— জলযোগ করিতে অনুরোধ করিল।

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন "শুভা! তুমি আমার সঙ্গে না খেলে, আমি কিচ্ছু খাবনা—বুঝলে?"

শুভা একটুকু মুচকি হাসিয়া বলিল "তা হয় না— আপনি-খান।"

প্রত্যুত্তরে ননীবাবু একটুকুন দমিয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, এমন একদিন ছিল,— যেদিন আমার সহিত জলযোগ না করলে শুভার তৃপ্তি হত না— আর আজ— "তা হয়

না।" দুঃখে অভিমানের ব্যাথায় ননীবাবুর বুক টন্ টন্ করিতে লাগিল। ননীবাবু একটুকু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন "বাবা মার সম্মতি নিতে হ'বে নাকি?"

শুভা নিতান্ত সহজভাবে বলিল "অনুমতি নিবার কোনই প্রয়োজন দেখি না।"

"তবে?" বলিয়া ননীবাবু শুভার মুখের উপর দৃষ্টি বিন্যস্ত করিলেন।

শুভা একটুকু দৃষ্টি নত করিয়া বলিল "আমি মিষ্টি টিষ্টি খাব না, শরীর ভাল না,— আপনি খান।"

ননীবাবু শুভাকে পার্শ্বের আসনে বসিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। শুভা ননীবাবুর মুখের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিল। হৃদয়ের সমস্ত দৃঢ়তা, ননীবাবুর অনুরোধে যেন এক মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। শুভা মস্তক নত করিয়া দুই একটি মিষ্টি মুখে গুঁজিয়া দিল।

ননীবাবু লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "শুভা! উষাকে নিয়ে "আসানসোল" যাবার কথা হয়েছে। তা হয় ত তুমি শুনে থাক্‌বে।"

শুভা জড়িতস্বরে বলিল "হাঁ— শুনেছি।"

"এতে তোমার মনে আনন্দ হয় নি?"

"আনন্দ হলেও— আবার সঙ্গে সঙ্গে নিরানন্দের একটা সাড়া প্রাণে জাগিয়ে দিচ্ছে।"

"কেন? বল্‌বেনা!"

"আপনার অধৈর্য্যতা দেখে। আপনি বিদ্বান, জ্ঞানী,— ভেবে দেখুন, আমি আপনার কে? তা জেনেও আপনি চিত্ত স্থির কত্তে পাচ্ছেন না।"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন "কত চেষ্টা কচ্ছি— বিশেষ কোন ফল হচ্ছে না।"

শুভা বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিল "সে কি কথা? আপনি পুরুষ, আপনাদের নিকট আমরা চির দিনই পরাস্ত স্বীকার করে থাকি। আর আপনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন? ভেবে দেখুন আপনার উপর একটা নিরপরাধিনীর ভাল মন্দ কি ভাবে

জড়িত রয়েছে। উষা দিদির উপর আপনার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে,— তা ভুলে গেলে, ধর্ম্মের চক্ষে আপনি দোষী হ'তে বাধ্য! আপনাকে অতীত স্মৃতি ভুলতে হ'বে,—ইহা যদি না পারেন তবে আপনার দেব দুর্ল্লভ চরিত্রে কালিমা লিপ্ত হবে!"

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন "একজন পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ,— সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ বলে কেউ ধারণা করে না।"

শুভা তাহার তেজব্যঞ্জক দৃষ্টি ননীবাবুর মুখের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিল "উষা দিদি তা'তে মত দিবে কেন?"

ননীবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন "উষা এতে অমত করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।"

শুভা তাহার দৃষ্টি আনত করিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিল,— স্ত্রীলোকের পক্ষে আর সকল অনুষ্ঠান সম্ভবপর হলেও,—স্বইচ্ছায় সতীনের ঘর কত্তে কেউ চায় বলে মনে হয় না। উষা দিদি যদি

সম্মতি: দেয়,— সে যে তোমারি তৃপ্তির জন্য,— তোমাকে সুখী করবার জন্য! এরূপ সম্মতির উপর এতবড় দায়ীত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের ভিত্তি গ্রথিত করে, সংকল্প কার্য্যে পরিণত করার মত,—ভ্রমাত্মক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? উষা দিদি দেবী,— সম্মতি দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব না হলেও,— আমারও ত একটা কর্ত্তব্য রয়েছে,— আমাকে এর প্রতিকূলে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইতেই হবে। অতঃপর শুভা প্রকাশ্যে, দৃঢ়স্বরে বলিল "তা হ'তে পারে না।" বলিয়া শুভা স্থির দৃষ্টিতে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বুকের ভিতর একটা শঙ্কিত উচ্ছ্বাস, মুক্ত তটিনীর ন্যায় যেন তর্ তর্ বেগে বহিতে লাগিল। শুভা মুক্ত গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

ঠিক এমনি সময়ে অসিতবাবু ডাকিলেন "শুভা! এদিকে আয় মা!"

শুভা ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,— এবং ননীবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া,— ধীর

পদ-বিক্ষেপে, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মনীবাবু উষাকে সঙ্গে করিয়া আসানসোল আসিলেন এবং অসিত বাবুর উপদেশানুযায়ী কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেম। প্রায় দশ ঘণ্টার অধিক সময় কয়লার খনির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত কার্য্যে সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিলেন। নিম্নতম কর্ম্মচারীগণের অভাব অভিযোগ যথাসাধ্য অপনোদন করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন। ম্যানেজার সাহেবের নির্দ্দিষ্ট বাসায় তিনি বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং অসিত বাবুর বাসার একটি প্রশস্ত কক্ষেই বসত বাস করিতে লাগিলেন। অসিতবাবুর একান্ত

অনুরোধে, তাঁহাদের সহিতই আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

গৃহিণী ননীবাবু ও ঊষাকে স্বায় সন্তানের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং ইহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। কোন অভাব অনুভব করিবে এই আশঙ্কায় গৃহিণী তাঁহাদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহাতে যাহা করা দরকার এবং বাস্তবিক তাঁহারা যতটুকুন প্রাপ্য বলিয়া আশা করিতে পারিত, তাহা অপেক্ষাও অধিক যত্ন লাভ করিয়া উভয়েই নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িত। ননীবাবুর বেতনের সমস্ত টাকা যাহাতে জমা থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অসিতবাবু ননীবাবুকে হাত খরচ বাবদ আরও পঞ্চাশ টাকা প্রতিমাসে দিতে লাগিলেন। ননীবাবু অসিত বাবুর অত্যাধিক আদর যত্নে, এতটা সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন যে গৃহিণী তাঁহাদের ঈদৃশ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতেন। তিনি বলিতেন— আমি তোমাদিগকে পেটের সন্তান অপেক্ষা অধিক

স্নেহের চক্ষে দেখি, তোমাদিগের সঙ্কোচিত ভাব আমাকে বাস্তবিকই অত্যন্ত পীড়ন করে। ননীবাবু ও ঊষা নিঃসঙ্কোচে আব্দার করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু একটা বাঁধ বাঁধ ভাব অজানিত তাহাদের চলা ফেরার ভিতর আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিত বলিয়া, সময়ে সময়ে তাহারা অসিতবাবু ও গৃহিণীর নিকট অপ্রতিভ হইয়া পড়িত।

সমস্ত সুখ শান্তির অধিকারী হইলেও,—ননীবাবুর পক্ষে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করা বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। ননীবাবু সমস্ত দিন আফিসে বেশ সহজ ভাবে, কাজ কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। বাসায় ফিরিলেই তাঁহার মনের ভিতর এক অসীম স্মৃতি জ্বালা জাগরিত হইয়া, তাঁহাকে একেবারে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিত। তিনি শুভার চিন্তা যতই মন হইতে দুরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন, স্মৃতিটুকু যেন ততই প্রবল বেগে, শত মুখে, তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া, এক অসীম বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিত।

ননীবাবু শুভাকে দেখিলে, নিতান্ত সহজ ভাবে, বিভিন্ন পথে চলিয়া যাইতেন। কোন বিশেষ কার্য্য গতিকে শুভাকে কোন প্রশ্ন করিতে হইলে, ননীবাবু প্রাণ-পণে আপনাকে সংযত রাখিয়া কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এত সতর্কতা সত্বেও, তিনি সময় সময় এমনি কিছু অসংলগ্ন ও নিরর্থক কথার অবতারণা করিতেন, যাহার অর্থ বহু চেষ্টায় তিনি নিজেই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। শুভা সেই নিরর্থক কথা শুনিয়া সময় সময় হাসিয়া ফেলিত। ননীবাবু সেই বিদ্রূপ হাসিতে অপ্রতিভ হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। তিনি ভাবিতেন আমার কি হ'ল? পুরুষের পক্ষে এমন কি অসাধ্য কাজ থাকতে পারে,— যা সামন্য যুবতীর পক্ষেও করায়ত্ব করা সহজ সাধ্য? শুভা আপনাকে সংযত করে, বেশ সহজ ভাবে কালযাপন কচ্ছে, আর আমি কিনা— বিদ্যার জাহাজ মাথায় নিয়ে, এত সহজে তার নিকট অপদস্থ হ'তে বাধ্য হচ্ছি!

শুভা অধিকাংশ সময় উষার সহিত একত্র

খাস করিয়া—নানা গল্প গুজবে সময় কাটাইয়া দিত। সময়ে সময়ে উষার আকস্মিক মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, শুভা মুসড়িয়া পড়িত। সেই পরিবর্ত্তনের কারণ যে স্বামী স্ত্রীর অনৈক্যতার ফল, ইহা অনুমান করিয়া, শুভা নিজকে তজ্জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া,—একেবারে দমিয়া যাইত। শুভা অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিত, উষা ননীবাবুর সেবা, যত্ন প্রাণ পণে করিতেছিল, কোন ত্রুটীর ভয়ে সর্ব্বদা, সমস্ত কাজ নিজ হাতে করিয়া, স্বামীর তুষ্টি সম্পাদনের জন্য আত্ম নিয়োগ করিতেছিল। সামান্য কারণে স্বামীর দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়াও, হাসি মুখে সে সমস্ত উড়াইয়া দিতে ছিল। কোন দিনই উষা সেই সমস্ত প্রসঙ্গ লইয়া আপনাকে বিব্রত হইতে দিতেছিল না। ইহা সত্বেও ননীবাবুর ব্যবহারের মধ্যে একটুকুন নুতনত্ব ভাব যেন বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছিল।

শুভা কখনও উষার নিকট এসমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, উষা হাসি মুখে বলিত— সারাদিন

খেটে খুটে আসেন, তাই সহজে মাথা গরম হয়ে যায়। আমাদের কর্ত্তব্য, সে সমস্ত অগ্রাহ্য করে, যা'তে তাঁরা শান্তি লাভ কত্তে পারেন, তার'ই চেষ্টা করা। এতটুকুন কর্ত্তব্য পালন কত্তে সক্ষম না হলে, স্বামীর নিকট হতে বহুবিধ অনুগ্রহ লাভ করবার আশা নিতান্ত স্বার্থপরতামূলক বলেই বিবেচিত হবে।

শুভা— উষার প্রত্যুত্তরে একেবারে মুগ্ধ হইয়া ভাবিত— এক জনের উপর এমনি করিয়া স্থায়ী দাবী করবার অধিকার লাভ কত্তে হলে— তাঁকে সাধনার বস্তু কল্পনা করতেই হবে। তাঁ'র জন্য আমিত্বটুকুন বিদায় দিতে না পারলে,— সিদ্ধি-লাভের আশা নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হয়। সেই ধ্যানবিহ্বল চিত্তটি এমনি করে সর্ব্বস্ব দিয়ে, নিতে চেষ্টা না করলে— তাঁকে প্রাণের সীমান্ত সীমায় প্রতিষ্ঠিত করা কোনদিনই সহজ সাধ্য হতে পারে না। এমনি ভাবে ত্যাগী হতে না পারলে, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ একেবারে এক করে দেওয়ার সুখভোগ কারো ভাগ্যে ঘটে উঠে না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সময় সময় শুভা নির্জনে বসিয়া ভাবিত,—

"আমার জীবনের সার্থকতা কোথায়? আমার চক্ষে যেই অসীম আলোক ধারা, বিপুল আয়োজনে ফুটে রয়েছে,— সেই আলোক দিয়ে সমস্ত অন্ধকার ঘুচাতে চেষ্টা করলে,— সঙ্গে সঙ্গে আরও এক জনের জীবনের সমস্ত আলো কেড়ে নিতে হ'বে! এরূপ স্বার্থপর হবার জন্য যখন প্রস্তুত নই,— তখন জগতের সমস্ত শোভা, তৃপ্তি হ'তে বঞ্চিত হবার মত শক্তি-সঞ্চয় করতেই হবে। সমস্ত ত্যাগের ভিতর নিজকে ডুবিয়ে রাখতে না পারলে,— অন্তরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় ত্যাগের মহিমাময় ছবি আঁকড়িয়ে ধরতে না পারলে, পরার্থে জীবন বিকিয়ে দিবার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হতেই হ'বে! আলোর স্পর্শ অনুভব করবার সম্মুখে যখন এত বড় প্রাচীরের বেষ্টন জেগে রয়েছে, তখন স্মৃতি-ঘেরা আলোর ভিতরই, স্বার্থকতা অনুভব করতে না চাইলে; সমস্ত ব্যাথা বেদনার ম্লান উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে আলোর ধারা উদ্ভাসিত করে

তুল্‌তে না পারলে, সাধনা কোন দিনই সিদ্ধির পথ ধরতে পারবে না! জীবন সমুদ্রের ঢেউগুলি, উচ্ছল, চঞ্চল, ফেনিল হয়ে, বৈচিত্র্যময় উদ্দামে গ্রাস কত্তে যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সেই উদ্দাম সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, তাল-হারা হলে, উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রশ্রয় দিতে চেষ্টা করবে! ভালবাসার অধিকার লাভ করা এক কথা, আর সেই ভালবাসার জনকে লাভ করবার সফলতা হচ্ছে আর এক কথা! তিনি আমাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছেন, তা তাঁ'র চলা ফেরাতেই আভাস দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অপনাকে জোড় করে নিথর নিবিড় অন্ধকারের ভিতর লুকাইত করবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা কচ্ছেন। আমি চোখের উদ্গত অশ্রু চেপে, চোখ ঝল্‌সান দীপ্তির উপর, কাল-কাজলের প্রলেপের মত, মায়া মেঘের সজল ছায়া বিস্তার করে, দূরে সরে থাকতে চেষ্টা কচ্ছি! মাতাল ঝড়ের সাথে সুর মিলায়ে পাল্লা দিতে চাচ্ছি, কিন্তু তা'তে বিক্ষিপ্ত আকর্ষণের ঘাত

প্রতিঘাত এড়াতে পারি কোথায়? অসহিষ্ণুতার বেদনার ভারে হৃদয় ভারি হয়ে উঠলেও, প্রাণ পণে ঢেকে রাখবার জন্য কত চেষ্টা কচ্ছি, তার পরিণাম কোথায়, কতটুকুন তা কে বলতে পারে”

শুভা সর্ব্বদাই আপনাকে ফুল্ল কমলের মতই ফুটাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু অন্তরের অসহনীয় জ্বালায় সময় সময়, তাল সামলাইতে অসমর্থ হইয়া, আপনাকে নিতান্ত অসহায়ের ন্যায়, ননীবাবুর নিকট ধরা দিয়া, একেবারে মুসড়িয়া পড়িত।

আজ রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘের কালো ছায়ায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। মেঘের মধ্যে, মেঘের আলিঙ্গনের ভিতর দিয়া, বিদ্যুৎ আলো ক্ষণকালের জন্য বিকশিত হইয়া, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, আলোকিত করিতেছিল। পথের জন কোলাহলের অশ্রান্ত ছুটাছুটি থামিয়া গিয়াছিল। নিতান্ত অসহায় শিশুর মত, মাতৃকোলে ধরিত্রী যেন একটা প্রলয়ের আশঙ্কায় একেবারে

নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল! দেখিতে দেখিতে ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। শীতল জলধারা বক্ষে করিয়া, বর্ষণ রত মেঘগুলি মেঘের সহিত আলিঙ্গন ফলে, বিদ্যুৎ জ্বালায় বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এমনি সময় ঊষা ঘরের মেঝের উপর বসিয়া পাণ সাজিতে ছিল। শুভা চুপটি করিয়া তাহারি নিকটে বসিয়া, পান সাজা দেখিতেছিল। ঊষার মুখে বিষাদ কালিমা-লিপ্ত! একটা বুকে-পোষা অসহ্য দুঃখের ভয়াবহ দৃশ্য সমস্ত মুখের উপর প্রতিফলিত হইয়া ছিল! শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল "ঊষা দি! আজ খাবে না? সমস্ত দিন কেটে গেল, একটুকু জলও যে মুখে দিলে না!"

ঊষা একটুকু শুষ্ক হাসির সহিত বলিল "তিনি যে সমস্ত দিন উপস করে কাটিয়ে দিলেন। আমার খাওয়া তাঁ'র চেয়ে এতই বেশী দরকারী!"

শুভা দৃঢ়স্বরে বলিল "সামান্য কারণে তিনি কেনই বা এত-টা রাগ করলেন, তা ঠিক বুঝে

উঠতে পাচ্ছি না; এরূপ রাগত তাঁকে কখনও কত্তে দেখিনি! চা দিতে একটুকু দেরী হয়েছে বৈত নয়, তার জন্য এতটা করা বোধ হয় ঠিক হয় নি! বাবা শুনে বল্লেন, ছেলে মানুষ কিনা, সহজেই রাগ করে বসে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এসব কিছুই থাকে না। তিনি তাঁকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। তোমাকেও খেতে যেতে বলেছেন,... বুঝলে?"

শুভার সহানুভূতি সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ঊষা বিচলিত হইল। চোখের অশ্রুধারা গণ্ড ভাসাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া বুকের কাপড়ের উপর পড়িতে লাগিল। দুই হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়টা চাপিয়া ধরিয়া, অশ্রুজড়িত কণ্ঠে ঊষা প্রত্যুত্তর করিল "তাঁ'র কি দোষ? আমি যদি আর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে চা তৈরী করে দিতে পাত্তুম, তবে হয়ত তিনি কিছুতেই অসন্তুষ্ট হতেন না।"

শুভা একটুকুন উত্তেজিত স্বরে বলিল "তা' হলেও...তিনি একটুকু বুঝতে চেষ্টা করে, এতটা

না করলেও পারতেন !”

ঠিক এমনি সময়ে ননীবাবু ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শুভা ননীবাবুকে দেখিয়া মাথা নীচু করিল। তাহার মুখের অবশিষ্ট কথা মুখেই রহিয়া গেল।

শুভা কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া, সলজ্জ ভাবে ননীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল “আপনি রাগ করে চলে গেলেন, তারপর বাজার হতে মিষ্টি এনে বেশ্ এক পেট্ খেলেন, আর উষা দি সমস্ত দিন উপুস করে কাটিয়ে দিল। মা বল্লেন… “গর্ভাবস্থায়” এরূপ উপুস করে থাকা ভাল হয় নি। আপনাকে ফেলে দিদি কিছুতেই কিছু খেল না।”

অকস্মাৎ কোন অন্যায়ের মাঝে মানুষ হঠাৎ ধরা পড়িলে যেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়ে, শুভার কথায় ননীবাবুর মুখও তেমনি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ শুভার অনুযোগ বাক্য ননীবাবুর অন্তরে এমনি একটা অগ্নিবাণের মত দাগ বসাইয়া দিল, যাহার ঝাঁজ টুকুন তাঁহার

শিরায় শিরায় এক মূর্চ্ছনা জাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ননীবাবু ভাবিতে লাগিলেন,— এই ব্যাপারে শুভা আমাকে নিতান্ত ছেলে মানুষ বলেই ঠাওর করে নিয়েছে; ছিঃ এতটা করা আমার ঠিক হয় নি। ননীবাবু শেষে আত্মগোপন করিয়া বলিলেন "আমি মিষ্টি কিনে খেয়েছি, একথা তোমাকে কে বললে ?"

শুভা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল "বাবা খবর নিয়েছেন,— তাঁর মুখেই শুনেছি। আপনি মনে করেন,— যা করেন তা আর কারো টের পাবার যো নেই—নয় ? বাবা বল্‌লেন ছেলে মানুষ— কতক্ষণ রাগ করে থাক্‌বে, ঊষাকে এখন খেতে বল।"

ননীবাবু—শুভার কথায় একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন। লজ্জায় তাঁহার মস্তক আনত হইয়া গেল ! ননীবাবু নির্ব্বাক নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিলেন।

শুভা সহাস্য বদনে বলিল "আমি এখন যাই,— আপনার আহারের যোগাড় করে দিতে বলি

গে।" অতঃপর শুভা ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

উষা এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। তাহার অন্তরে দু'কূল ছাপিয়া যে রোদন জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার আভাস-টুকুমও, শুভাকে জানিতে দেয় নাই। সমুদ্রের জলকে যে কেবল চন্দ্রের আলোই নাচাইয়া তোলে না, মেঘ ঝড় ও যে তাহাকে নাচাইয়া ক্ষ্যাপাইয়া তোলে, সে কথাটা কত প্রকারে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াও,— উষা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইল না। মেঘের আলিঙ্গনের ভিতরকার বিদ্যুৎছটাকে, আড়াল করিয়া দিয়া, তাড়িতপৃষ্টের জ্বালা বুকে পুষিবার সাধনাই উষা প্রাণপণে আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কাজেই সমস্ত উচ্ছ্বাস নীরবে সহ্য করিতে যাইয়া, নালিশ অভিযোগ, ও

কারণ বিশ্লেষণ করিবার মত প্রশ্ন উত্থাপন করিবার স্পৃহা, ঊষা একান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ননীবাবু ঊষার প্রতি তাকাইয়া ডাকিলেন "ঊষা!" ঊষা নত মস্তকে স্বামীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল।

ননীবাবু তীব্রস্বরে বলিলেন "তোমার সাথে যে আমার ঝগড়া হয়েছে, একথা শুভা কি করে জানলে? কাজের খুব ভিড়, তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, খেয়ে যাবার সময় নেই,— এসমস্ত জানিয়েই ত আমি আফিসে গিয়েছিলুম। এতটা জানাজানি হবার কারণ কি?"

ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিল "শুভা কামরার পাশেই দাঁড়ান ছিল, সে-ই সব শুনে জানিয়ে দিয়েছে। জ্যাঠা মশায় আমাকে এসব জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি এসমস্ত অস্বীকার করেছি। শুভা কোন অন্যায় কথা বলেনি,— এতে কোন অন্যায় হয়েছে বলে কেউ মনেও করেনি। তুমি না খেলে— আমিও খেতে

পারি না— তাই মাত্র বলেছি।”

ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অনিশ্বাসিত রুদ্ধ বায়ু-প্রবাহ যেন জমাট বাঁধিয়া তাঁহার ভিতরে বাহিরে একটা প্রলয় ঝটিকার সৃষ্টি করিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি আভ্যন্তরিক উত্তেজনায়, বাঘের চোখের মতই উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। ননীবাবুর মনে হইতে লাগিল— এ-কি অকথ্য কলঙ্কের ডালি আমার মাথায় চেপে বস্‌ল? একটা বেহিসাবি কাণ্ড করে, কেন আজ আমি নিজকে জটিলতার মধ্যে জড়িত করে ফেল্‌লুম। এর বিপুল লজ্জার বোঝা যে আমি সইতে পাচ্ছি না।

সাধারণত সংযত লোক অপরের দোষারোপে সহজে দমিয়া যায় না। যদি উহার ভিতর সামান্য সত্যও নিহিত থাকে— তবু প্রাণপণে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। তবে সেই দোষারোপকারী যদি যুবতী হয়, প্রণয়িণীর স্থান দখল করিবার উপযুক্তা হয়,— তবে সেই কথার ঝাঁজ, জলন্ত তরল ধাতুর প্রবাহ অপেক্ষাও অনেক বেশী বলিয়া মানিয়া লইতে

বাধা হয়। ননীবাবুর মনে, শুভার "মোলায়েম" ভৎর্সনা-পূর্ণ কথা কয়টি যতই জাগরিত হইতে লাগিল, ততই তাহার সর্ব্ব শরীর মন যেন গুটাইয়া, এতটুকুন ছোট হইয়া যাইতে লাগিল। ননীবাবু হঠাৎ সংযত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, কঠিন রূঢ়স্বরে বলিলেন "এ সমস্ত মিথ্যা বলেই মনে হয়, তুমি তাকে নিশ্চয়ই বলেচ, তারই ফলে এতবড় কেলেঙ্কারী আমাকে মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। তোমার নিকট যদি আমি এতটুকুন ধৈর্য্য, ও নীরবতা আশা কত্তে না পারি, তবে তোমাকে নিয়ে সংসার ঘর করা আমার পক্ষে নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র।"

কথা শুনিয়া ঊষার বুকের ভিতর অভিমানের উৎস উথলিয়া উঠিল। সে আতঙ্ক ভরা অন্তর লইয়া, নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত্ত ননীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিল। শেষে অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগ কিছুতেই ঠেলিয়া রাখিতে সক্ষম হইল না। গভীর পরিতাপে ঊষার বুকে বজ্রসূচি বিদ্ধ হইতে লাগিল। ঊষা নীরবে

কয়েক মুহূর্ত্ত সেই কথার আঘাত ব্যাথা উপভোগ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল "তোমার দুর্ণাম হবে এমন কাজ আমাদ্বারা সম্ভবপর হতে পারে এরূপ যে তুমি ধারণা করেছ, এতে আমাকে যতটুকুন কষ্ট দিচ্ছে, এর বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করে নির্দ্দোষী হবার চিন্তায়, তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট দিচ্ছে। আমি জানি আমি নির্দ্দোষী। —এর বেশী আর আমার বল্‌বার কিছু নেই।"

ননীবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন "এ-নিয়ে আমি আর কোন উচ্চবাচ্য কর্ত্তে চাই না,— কাউকে জিজ্ঞাসাও কর্ত্তে চাই না। কিন্তু তোমার এরূপ ব্যবহারে আমি দিন দিন যে কি অশান্তি ভোগ কচ্ছি— তার কতটুকুন তুমি জান্‌তে চেষ্টা কচ্ছ? স্ত্রী খাটী সঙ্গিনী না হলে— তার পক্ষে সংসারে বাঁচা মরা সমান কথা!"

কথা শুনিয়া উষার মনে হইল, উচ্চ চীৎকারে বাহিরের তুফানের উন্মত্ত বেগ, উন্মত্ত চীৎকার, অশনির কড় কড় নিনাদ, সমস্ত ডুবাইয়া দিয়া,

প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যের তালে বুক ফাঁটান আর্ত্তনাদ মিশাইয়া, ব্যস্ত স্বরে "ওগো! আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী— যদি বাস্তবিকই দোষী মনে করে থাক, তবে নিজ গুণে ক্ষমা কর,— তা না হলে আমি ত আর সইতে পারব না! তোমার নিকট প্রতারক সাব্যস্ত হলে,—আমার ত দাঁড়াবার স্থান নেই!"

অপ্রত্যাশীত ঘটনা চক্রের ঘাত প্রতিঘাত, তাহার উপর অনাহার ক্লেশ মিলিত হইয়া, ঊষার সুখলালিত কোমল দেহ-মনকে কেমন একটা ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঊষা অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট রব করিয়া, অনশন ক্লিষ্ট দেহ মূর্চ্ছিতের মতই, ভূমিতে লুটাইয়া দিল। নিখিলের সমুদয় বেদনা, যেন এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহার নেত্র পথে অজস্র ধারাকারে, ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল। ঊষার মুখের দীপ্তি নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনার ছাপ সেই ফ্যাকাশে মুখের উপর এমনি ভাবে প্রতিফলিত হইল

যে, ননীবাবুর চোখেও সেই দুঃখের তীব্রতম ইঙ্গিত টুকুন চাপা রহিল না !

ঊষা একবার মাত্র "মাগো !" উচ্চারণ করিল, তাহারপর আর কোন কথা পরিস্ফুট হইল না। ঠিক এমনি সময়ে একটি রাঙ্গা বিদ্যুৎ চমকাইয়া— আলোক ধারায় কক্ষটিকে উদ্ভাসিত করিয়া যেন নীরবে জানাইয়া গেল—জীবনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্ভোগের নেশায় উম্মাদগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট, অসম্ভব উচ্ছাসের অনুষ্ঠান, নিতান্ত যন্ত্রণা দায়ক বলিয়া, চিরদিন স্মরণে রাখিতে হইবে। ইহার ঘাত প্রতিঘাতে কত সংসার ছারখার হইতেছে,— তার হিসাব কে করিবে ?

——0——

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ননীবাবু ঊষাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাহার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত। হাত পা, ক্রমাগত

খিচাইতে ছিল। ননীবাবু শঙ্কিত চিত্তে, অতিকষ্টে ঊষার দেহ, পার্শ্ববর্ত্তী শয্যার উপর উঠাইয়া, দ্রুত ঘরের বাহির হইয়া গেলেন, এবং অসিত বাবুর নিকট যাইয়া মূর্চ্ছার বিষয় সংক্ষেপে বিজ্ঞাপন করিলেন।

অসিতবাবু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং ঊষার শিয়রে যাইয়া উপবেশন করিলেন। খবর পাইয়া গৃহিণী হরসুন্দরী ইতিপূর্ব্বেই শুভাকে সঙ্গে করিয়া ঊষার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলেন,— এবং শোচণীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া, চোখে মুখে শীতল জল সেচন করিতে লাগিলেন। শুভাও সজল চোখে ঊষার মস্তক স্বীয় উরুদেশে সংরক্ষণ করিয়া, পাখা দ্বারা ক্রমাগত বাতাস করিতে লাগিল।

ননীবাবু ঊষার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, শয্যা পার্শ্বে হতভম্বের মত, আড়ষ্ট ও গতিহারা হইয়া বসিয়া রহিলেন। নিদারুণ অজ্ঞাত আতঙ্কে তাঁহার সারা প্রাণ অবসন্ন হইয়া উঠিল। চোখের কোণে নিরাশার আকুল দৃষ্টি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ননীবাবু আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন শিক্ষিত হইয়া সাময়িক উত্তেজনায় মূর্খের মত ঘৃণিত ব্যবহার করিতে কেন কুণ্ঠা বোধ করি নাই? আমার আচার ব্যবহারে যে একটা ভীষণ নির্দ্দয়তার পূতিগন্ধ বাহির হইতে ছিল, তাহা কেন বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। পিতৃ মাতৃহীন,— অনাদৃত জন্মদুঃখী হইয়াও, শেষটায় রাজপ্রাসাদ লাভ ঘটিল,— কিন্তু তাহা পাইয়াও ত শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। নিজ দোষেই কালকূট ভক্ষণ করিয়াছি, চির কালই সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হইবে, অব্যাহতি নাই! ভগবান যাহার উপর বিরূপ হন, তাহার শান্তি কোথায়? সে সমস্ত পাইলেও, সুখ শান্তি হইতে বঞ্চিত হইবেই! হায়! অদৃষ্টের এ-কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

প্রায় পনর মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। তিনি শিয়রে বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। অনেক

যত্ন ও চেষ্টায় প্রায় তিন ঘণ্টা পর, ঊষার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার বাবু ঊষাকে দুগ্ধ পান করাইতে উপদেশ দিলেন। গৃহিণী চামিচে করিয়া ঊষাকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, প্রায় একঘণ্টা পর ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। আরও কিছুক্ষণ পরিচর্য্যা করিয়া, গৃহিণী,— ননীবাবুর অনুরোধে, শুভাকে লইয়া নিজের শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। অসিতবাবু ঊষাকে ঘুমাইবার জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়া, গৃহিণীর অনুসরণ করিলেন।

ননীবাবু ঊষার মস্তকে হস্তদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া, ক্ষীণ-স্বরে জিজ্ঞাস করিলেন "ঊষা! এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

এই অপ্রচ্ছন্ন সত্য স্বীকারের পরিবর্ত্তে, নিতান্ত লজ্জা বিজড়িত স্মিত মুখে ঊষা উত্তর করিল "কৈ আমার ত কোন অসুখ হয় নি। তবে শরীরটা একটুকু দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে!"

ননীবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, ক্ষুন্ন

কণ্ঠে বলিলেন যা হয়েছিল, তা আর বলে কাজ নেই। তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে, ডাক্তার এসে ঔষধ দিয়ে গেছেন। কলিকাতা তার করে দিয়েছি, তাঁরা কাল সকালের ট্রেনে এসে পৌঁছবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

ননীবাবুর উক্তিতে ঊষার ভাব-সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। জীবনের অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অফুরন্ত বাসনা লইয়া তাহাকে যে ভাবে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে, সাহারার দিগন্ত বিস্তৃত বালুরাশির মত নীরস আশাহীন প্রাণ লইয়া যে অসহ্য জীবন ধারণ করিতে হইতেছে,—তাহার ভিতর আজ যেন সহসা অর্গলবদ্ধ নিরুপায় জীবের ব্যাথা কাতর স্মৃতি মথিত করিয়া, এক অসীম আশার ধারা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

গন্ধে সুর ভরা থাকিলেও যেমন, সুর লয় তান হাতের পরশে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না,—উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতের পরশে সেই নীরস কাঠের দৃঢ়তার ভিতর দিয়াই মধুর সুরের ফোয়ারা ছুটিতে

থাকে,— সেইরূপ ননীবাবুর মিষ্ট কথা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও কোমল পরশে উষার বক্ষে, বহুদিন পরে, সুরের ধারা উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার প্রাণের তারে শান্তির ঝঙ্কার দিয়া যেন সপ্ত-সুর বাঁজিয়া উঠিল। উষা সকল সঙ্কোচ বিদায় দিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "এত কাণ্ড করে ফেলেছ? ছিঃ! এতটা না করলেই ভাল হত। আমার মৃত্যু—সে ত সহস্রবার বাঞ্ছনীয়! আমি ভাল হয়েছি— কলিকাতা তার করে তাদের আসতে নিষেধ করে দাও।" বলিয়া উষা শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র জড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

ননীবাবু ক্ষণ কাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন। শেষে চোখ তুলিয়া উষার সমুৎসুক ঈষদুত্তেজিত মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, আবেগ-মথিত বক্ষে উষাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন "আর কখনও তোমাকে কিছু বল্‌বনা। যে ভয়ই দেখিয়েছ— কাউকে এখন মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ

হচ্ছে। কর্ত্তা অনেক মন্দ বলেছেন। তোমার এ-অবস্থায়, সামান্য উত্তেজনাতেই, বিশেষ খারাপ হ'তে পারে তাও— জানিয়ে দিয়েছেন। তা তাঁরা কলিকাতা হ'তে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছেন। আসলে এক রকম মন্দ হবে না।"

ঊষা অভিমান ভরা কাল চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে খোলা জানালার বাহিরে গিয়া অকস্মাৎ কোন অনির্দ্দেশ্য শূন্যতায় স্থিতি লাভ করিল। শেষে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ব্যাগ্রকণ্ঠে বলিল "আসলে মন্দ হবে না— এর অর্থ ?"

ননীবাবু ভাষাভরা মৌন চক্ষুতে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "তোমাকে এখন কিছুদিন কল্‌কাতা রাখ্‌ব বলে মনে করেছি।"

ঊষা ত্বরিত ননীবাবুর বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বলিল "আমি এখন কোথায়ও যাব না।"

ননীবাবু ঊষার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তে তুলিয়া লইয়া স্মিতমুখে বলিলেন "কেন যাবে না ? এখানে

কত কষ্ট পাচ্ছ. ওখানে গেলে এত অশান্তি ভোগ কত্তে হবেই না।"

কথায় বাধা দিয়া উষা তীব্র স্বরে বলিল "তোমাকে এখানে একা ফেলে আমি কোথায়ও যাব না। তবে তুমি যদি জোর করে পাঠিয়ে---।" উষার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। স্বামীর গলা জড়াইয়া ক্রমাগত ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যুত্তরে ননীবাবু একটুকুন বিচলিত হইয়া পড়িলেন। শেষে শান্ত ও সংযত স্বরে বলিলেন "ছিঃ! কেঁদনা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কলিকাতা যাওয়া,— সে পরের কথা,— পরেই বিবেচনা করা যাবে।"

স্বামীর আশ্বাস বাক্যে উষার অন্তর পুলকো-

চ্ছাসে পূর্ণ হইয়া গেল। উষা আনন্দোদ্বেলিত বক্ষে সংযত স্বরে বলিল "আচ্ছা—একটি কথার ঠিক উত্তর দিবে ?"

ননীবাবু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন "কি কথা ?"

উষা স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া বলিল "আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না ? তুমি আমাকে যাইতে মানে কর না কেন, তোমাকে ছেড়ে থাকবার কথা ভাবতেই,— আমার বুক যেন কেমন করে উঠে। পুরুষ মানুষের হৃদয় বড়ই কঠিন— নয় কি ?"

উষার প্রশ্ন শুনিয়া ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। শেষে কোন মতে ভাষা খুঁজিয়া লইয়া, ক্ষীণস্বরে বলিলেন "কষ্ট হয় বৈ কি ! তবে তোমার অবস্থা দেখে খুব ভয়ই হচ্ছিল। তাই কলিকাতা পাঠাব বলে মনে কচ্ছি।"

উষা একগাল হাসিয়া বলিল "আমার কিচ্ছু হয় নি। তোমার কাছে থাকাই আমার স্বর্গবাস।" বলিয়া স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া আপন-

মনে ভাবিতে লাগিল "তোমার এতটুকুন স্নেহ ও যত্নে যে কি শান্তি লাভ করি, তা তুমি কি বুঝ্বে ? তোমার সকল অত্যাচারের ভিতরও তোমাকে দেখ্লে,— যদি সমস্ত অশান্তি ভুলে যেতে না পারি, তবে নারী জন্মের সার্থকতা কোথায় ? তোমার কাছে থাক্লে—মরণকেও ডাকতে ভয় হয়। স্ত্রীলোক এই একমাত্র সম্বল ছেড়ে কোথাও শান্তি লাভ কত্তে পারে না,— এ যদি তোমরা বুঝ্তে তবে আমাদের কোনই দুঃখ থাকৃত না। স্বাধীনতা নারী জীবনের সার্থকতা নহে, পুরুষের ন্যায় অধিকার লাভে তাহাদের সার্থকতা হয় না।" ঊষা শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল "তা আমি বলে রাখছি, তোমাকে ছেড়ে কোথায়ও যাব না। এখানে আমার কোনই অসুবিধে হবার কারণ নেই। তবে— ।"

ননীবাবু ঊষার কোমল হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "তবে— কি ঊষা ?"

ঊষা গম্ভীরস্বরে বলিল "সে অনেক কথা—

তা একদিন সময় মত শুনিও।"

নবীবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "আজই বল, আমার শুনতে খুবই ইচ্ছা হচ্ছে।"

উষা নবীবাবুর উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তোমার স্নেহ মাখা কথা শুনে আজ আমার মরুদগ্ধ জীবনে আনন্দ ও আশা যেন ফিরে এসেছে। এরূপ প্রাণ খোলা কথা তোমার নিকট অনেকদিন হয় শুনিনি। আগে তোমাব উন্মাদ ভালবাসায় আমাকে উন্মত্ত করে তুলত। কিন্তু কয়েক মাস যাবত আমি সে সবই হারিয়ে ছিলুম। বাইরের জগৎ হতে রূপ, রস, শোভা, সম্পদ যা কিছু নেবার সবই যেন আমার নিকট মৃত ছিল। জীবনের সকল তৃপ্তি, তৃষার যেন সমাধা হয়ে গেছিল। কিন্তু আজ আমার জীবন-অঙ্কের এক শুভ দিন বলেই মেনে নিয়েছি,— আজ বুঝ্তে পাচ্ছি আমার পাবার আশা করবার মত পৃথিবীতে অনেক জিনিষ এখনও রয়েছে। আর আমি যাঁকে জীবনের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে প্রাণ ভরে ভাল বেসেছিলুম—তিনি এখনও আমারি রয়েছেন,—

তিনি আমার মৃত্যু আশঙ্কায় হতঃভম্ব হয়ে পড়েছেন। তাই আজ শরীরে পূর্ণ শক্তি ফিরে পেয়েছি। সংসারে মানুষ যখন তা'র সমস্ত আশা, ভরসা হারিয়ে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়, তখন তা'র মনের অবস্থা যা হয়,— আমারও এখানে আসা অবধি তাই হয়েছিল। তাই আজ তোমার সামান্য কথার ঝাঁজ সহ্য করবার ক্ষমতা হারিয়ে, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু এই শুভ মুহূর্ত্তে আমি সেই সব স্মৃতি ভুলবার মত শক্তি লাভ করেছি বলেই—আর তোমাকে ছেড়ে কোথায়ও যেতে মন চাইছে না।" ঊষা শেষে তাহার জলভরা বিশাল চোখ দুইটি তুলিয়া ননীবাবুর প্রতি তাকাইল।

ননীবাবু ঊষার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়াছিলেন। ঊষার সেই দৃষ্টির মাঝে উদ্বেলিত স্নেহ-সিন্ধু মুহূর্ত্তেই ননীবাবু অনুভব করিয়া, হতভম্ব হইয়া গেলেন। প্রতি কথার ঝাঁজে ননীবাবুর বক্ষ সবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রায় বুজিয়া আসিতে লাগিল। ঊষাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা কিছুই যেন

নেই,—এই দুঃখের— এব্যাথার, সান্ত্বনা বুঝি কিছুই নেই— এরূপ ননীবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট নীরবে বসিয়া থাকিয়া ননীবাবু অতি কষ্টে গলা ঝাঁড়িয়া— গাঢ় স্বরে বলিলেন "ঊষা! আমি তোমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছি,— আমাকে ক্ষমা কর।"

ঊষা অকুণ্ঠিত মুখে মৃদু হাসিয়া বলিল "তোমাকে ক্ষমা কর্‌ব? দেবতার কি দোষ হতে পারে যে ক্ষমা চাইতে যাবে? তুমি স্বামী—দেবতা, তোমার দোষ অন্তরে অন্তরে বিশেষ ভাবে অনুভব করে— দোষী সাব্যস্ত করে,— যেদিন বিচারকের ভার নিতে চাইব, স্বামীকে "ক্ষমার" মত একটা আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগায়ে তুলবার মত চেষ্টা কর্‌ব,—সে দিন যেন আমার মৃত্যু হয়! এতটা শক্তি লাভের আশা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।"

ননীবাবু আর কোনই প্রত্যুত্তর করিতে সক্ষম হইলেন না। ঊষার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার হৃদয় যে অসীম

আবেগে উদ্বেলিত ও পূর্ণ হইয়া উঠিয়া ছিল। তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।'

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শরতের প্রাতঃকাল। সূর্য্য কিরণ রেখার সুবর্ণোজ্জ্বল আলোকের বন্যায় ধরিত্রী স্নাত হইতেছিল। সুদূরে মসিপ্রলেপ বৃক্ষরাজীর পত্রাবলীর উপর আলোক লহরী নিপতিত হইয়া, স্বপ্নালোক রচণা করিয়া দিতেছিল। সম্মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গল,— প্রভাতের বর্ণচ্ছটায় হাসিতেছিল। সুদূর বাগান হইতে পুষ্প গন্ধবাহী দমকাবাতাস ছুটিয়া আসিয়া, চতুর্দ্দিক সৌরভময় করিয়া তুলিতেছিল। কৃষক বালকগণ ভুট্টা ও গমের বোঁঝা মাথায় করিয়া গান গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিতেছিল।

এমনি সময়ে ঊষা জানালার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, প্রকৃতির মধুর সম্পদ ও শ্যাম শোভা দেখিতে ছিল। পরিধানে ফিরোজ রঙের শাড়ী, কর প্রকোষ্ঠে সোণার চূড়ী ও ব্রেসলেট্, গলায় অসিতবাবু প্রদত্ত সুন্দর হার। নয়ন যুগল সৌন্দর্য্যরাগোজ্জ্বল চঞ্চল কটাক্ষময়। সূর্য্যের ক্ষীণ লোহিত আভা তাহার ভাবময় মুখখানি অনুরঞ্জিত করিতেছিল। অলকদাম মৃদুল সমীরণ স্পর্শে ললাটের চারিদিকে উড়িয়া পড়িতেছিল। ঠিক সেই সময় ননীবাবু নিকটে আসিয়া ডাকিল "ঊষা!"

ঊষা তাহার গভীর ভাবময় বিশাল চঞ্চল নয়ন যুগল স্বামীর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া সহাস্য বদনে বলিল "কি গো!"

ননীবাবু স্মিতমুখে বলিলেন "কলিকাতা হ'তে তাঁরা সব এসেছেন। এস।"

ঊষা একগাল হাসিয়া ত্বরিত গতিতে সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া সন্নিহিত প্রশস্ত 'হল' ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল,— জনক ও জননী সেই কক্ষে

প্রবেশ করিয়াছেন। ঊষা সাগ্রহে সকলকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইতেই জননী তাহার নিকট আসিয়া বুকে টানিয়া লইলেন এবং সহাস্য বদনে বলিলেন "সমস্ত রাস্তা মনে যে কি উদ্বেগ নিয়ে এসেছি—তা তোকে আর কি জানাব। যাক্ তোকে দাঁড়ান দেখে, অনেকটা ঠাণ্ডা হলুম।"

ঊষা নিতান্ত সহজ ভাবে বলিল "মা! আমার কিছুই হয় নি, সুধু সুধুই "তার" করে তোমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছে। সামান্য মাথা ঘুরে পড়েছিলুম, এই মাত্র—।"

ননীবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি স্মিত হাস্যে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে বলিলেন "না মা! এসব মিথ্যা বল্‌ছে। তিন চার ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার এসে ঔষধ দিয়ে—তবে কত কষ্টে জ্ঞান করেছে। এখন বল্‌ছে কিছু হয় নি। একটুকুন রাগ করে ছিলুম— তাতে যে এতটা হতে পারে— তা কখনও ভাব্‌তে পারি নি।"

গৃহিণী বামা সুন্দরী সস্নেহে ননীবাবুর প্রতি

তাকাইয়া বলিলেন "তা— 'তার' করে বেশ করেছ। উষা ছোট কাল হতেই অভিমানিনী কিনা সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বেশী দূরের পথ নয়—এসেছি ভালই হয়েছে, অনেক দিন যাবত আস্‌ব আস্‌ব মনেও কচ্ছিলুম। অসুখ যে হয়েছিল— তা ওর চেহারা দেখ্‌লেই বুঝা যায়। মধুপুরে আমাদের নূতন বাড়ী তৈয়ার হয়েছে। আমরাও সেখানে কিছুদিন থাক্‌ব মনে করেছিলুম। যাক্‌ এই সুযোগে যাওয়া যাবে এখন।"

উষা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল "না —মা! আমার তেমন কিছু হয় নি। ভয়ে ভয়ে তার করে দিয়েছিল।" বলিয়া উষা বস্ত্রাঞ্চলে তাহার মুখখানা মুছিয়া ফেলিয়া—নিতান্ত সহজ ভাবে আপনাকে সকলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

রমেশবাবু উচ্চহাস্যে বলিলেন "আচ্ছা তোমাদের ভিতর কে দোষী কে নির্দ্দোষী পরে সাব্যস্ত হবে। পরে উষার মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন "এক

কাপ্ চা' আমায় এনে দাও দিকিন মা! সকল ঝঞ্ঝাটের ভিতরও— আমার এটা"চাই।”

উষা ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া দ্রুত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। রমেশবাবু উষাকে সঙ্গে করিয়া মধুপুর যাইবেন এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুদিন মধুপুর থাকিলে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এরূপ ব্যক্ত করিয়া অসিতবাবুও সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় উষাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখা যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা জানাইয়া রমেশবাবু ননীবাবুর মত চাহিলেন। তিনি উষার অনুরোধও অপরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। উষা সকলের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া

একেবারে দমিয়া গেল। উষা জনক জননীকে এবিষয়ে কিছু বলিতেও সাহস পাইল না। অথচ তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিতেও পারিল না।

সেদিন ছিল রবিবার। রমেশবাবু বেলা তিনটার গাড়ীতে মধুপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উষা শয়ন কক্ষের একপার্শ্বে একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল। কি এক অসীম দুশ্চিন্তায় তাহার মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উষা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল--আকাশ সমুদ্রের বুকের উপর ছোট বড় অসংখ্য মেঘের পানসা, পাল তুলিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে ছিল। মাঝে মাঝে সূর্য্যদেবের বুকের উপর দলবদ্ধ হইয়া— আলোক ধারা ধরিত্রীর বুক হইতে কাড়িয়া লইতে ছিল। উষা আপন মনে ভাবিতে লাগিল— মানুষের জীবন কি রহস্যাবৃত, এই একটানা ধারার কোথায় শেষ— ? কোথায় সেই পরলোক ? দুঃখীর সঘন গোপন শ্বাস যখন ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, তখন তাহার হিসাব

করিবার কি কেউ— নেই ? জীবনের চিরন্তন খেলার সমুদ্রে যেন সকলই মায়ার তরঙ্গ ! জীব জন্তুর বাস্তব কল্পনা সমস্তই— যেন তারি সহিত মিশিয়া এক অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে !

ঊষা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া, দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল— এভাবে স্বামীকে ফেলে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত হবেই না। মানুষের মন আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে কতক্ষণ আপনাকে সংযত রাখ্‌তে পারিবে ? তিনি আমার সুখ চেয়ে, প্রাণ-পণে আপনাকে সংযত রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছেন— এটা বেশ বুঝা যাচ্ছে। ঈপ্সিত পথের মোহজাল বুকে পুষে— একটা অভাবনীয় গোলমালের হাত হ'তে আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে, সতত চেষ্টা কচ্ছেন। তাঁকে ফেলে গেলে— পরিণামে কি হবে কে বল্‌তে পারে ? আর শুভা— তা'র ত কোনই দোষ নেই। সে জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বলি দিয়ে—আমারি মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখ্‌তে

চেষ্টা কচ্ছে;— অন্তরের সমস্ত বৃশ্চিক দংশন সহ্য করেও, নিতান্ত সহজ ভাবে চলা ফেরা কচ্ছে,— বাহ্যিক কোনই অসংযমীর পরিচয় দিচ্ছে না। আমি কিছুতেই যাব না। বাবা, মা রাগ করবেন— তা কি করব! তাঁরা যদি সব দিক তালিয়ে দেখ্‌তে পাত্তেন,— তবে হয়ত নিতে চাইতেন না। ঊষার চিন্তা স্রোতে বাঁধা দিয়া, ননীবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া, মৃদু স্বরে বলিলেন “ঊষা! সময় হয়ে এল— যাবার জন্য প্রস্তুত হও।”

ঊষা ধীর পদ বিক্ষেপে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং স্বমীর গলা জড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল “আমি যাব না, তুমি যদি অমত কর তবে বাবা, মা কিছুতেই নিতে চাইবেন না, তোমাকে ফেলে আমার কোথায় যেতে ইচ্ছে হয় না। তুমি সুধু অমত কর্‌লেই হবে, বল তাঁদের বলবে?”

ননীবাবু ঊষার হস্ত আপনার হস্তে তুলিয়া লইয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন “ছিঃ! অমত করো না, তোমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়, এসময় বাপ মার

নিকট থাক্‌লে, অনেকটা নির্ভয়ে থাক্‌তে পরবে। মধুপুর ত বেশী দূরের পথ নয়,— আমি মাঝে মাঝে যেয়ে তোমাকে দেখে আসব। তারপর ভেবে দেখ বুড়োরা বলে থাকেন,—ঘোর কলিকাল কিনা, দেশের হাওয়া উল্টে গেছে। মেয়েরা বাপের বাড়ী যেতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, অশ্রুজলে রুমাল ভিজিয়ে ফেলে, আবার স্বামীর ঘরে যেতে হলে, অতিকষ্টে মনের উচ্ছ্বাস গোপন করে, চক্ষুদ্বয় রগ্‌ড়িয়ে— অথবা চোখে ঝাঁজাল তেল দিয়ে, তবে কোন মতে দুই এক ফোঁটা জল বের করে, দু'দিক বজায় রাখে। বিয়ের পরেই একেবারে স্বামীকে যথা স্বর্ব্বস্ব মেনে নেয়,—পুরাদাবী করে বসে। বাপ মার নামও ভুলে কত্তে চায় না। এমন অবস্থায় তুমি যেতে অমত করলে, নানা লোক নানা কথা বল্‌বে,— তোমার বাবা মা-ই-বা কি ভাবুবেন ?"

ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিল "তোমাকে ফেলে যেতে আমার মন সরছে না। আমি গেলে তোমার খুবই অসুবিধা হবে। কে-ই-বা

তোমাকে খাওয়াবে—কে-ই-বা যত্ন করবে? তারপর আফিস হ'তে খেটে খুটে বাসায় ফিরলে— একটুকুন বাতাস করে ঠাণ্ডা করবার লোক ও থাকবে না। এসব ভেবে যেতে চাই না।"

ননীবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "তা'র জন্য তুমি কিছু ভেব না, ঠাকুর চাকর রয়েছে। তুমি গেলে জেঠাই মা— এখনকার চেয়েও আমার খাওয়া দাওয়ার জন্য অধিক তদ্বির করবেন। তারপর শীত-কাল এল বলে, বাতাস করবার দরকারও হবে না। এসবের জন্য তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না,— বুঝলে?

ঊষা একটুকুন অপ্রতিভ হইয়া বিষাদ মলিন মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল "দেখ— এবার একটা অমঙ্গলের চিন্তা আমার মনে কেবলি তোলাপাড়া কচ্ছে।"

ননীবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন "অমঙ্গল চিন্তা আস্‌-বার কোনই কারণ দেখছি না। মানুষের মরা বাঁচা সে হল ভগবানের হাতে! মানুষ কি কত্তে পারে?

যেদিন ডাক আস্‌বে—, শত চেষ্টায়ও কেউ রাখ্‌তে পারবে না ! এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোন দিনই ঘটে নি,—আর ঘট্‌বার কোন কারণও নেই ! এসব চিন্তা করে তুমি মন খারাপ কর্‌লে, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে।”

ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল “আসল কথাটা এতক্ষণ বলিনি। শুন্‌লে হয়ত তুমি হেসেই উড়িয়ে দিবে,— তাই বল্‌তে সাহস পাচ্ছি না।”

ননীবাবু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন “সে আবার কি কথা ? না বল্‌লে আমি কি করে বুঝ্‌ব ? বলই না কি হয়েছে ?”

ঊষা ভীতি চকিত নেত্রে স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল “পরশু রাত্রিতে তোমাকে দিয়ে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি— মন তাতে বড়ই খারাপ হয়ে গেছে।”

ননীবাবু উদাস ভাবে বলিলেন “স্বপ্ন কোন দিনই সত্য হয় না— মানুষ যা ভাবে,— তাই স্বপ্নে

দেখে থাকে।”

ঊষা ননীবাবুর তর্কের নিকট প্রতি কথায় পরাস্ত স্বীকার করিয়া একটুকু মৌনভাব ধারণ করিল; শেষে কয়েক মিনিট নীরবে থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল “তা তুমি যাই বল, আমার কিন্তু বড্ড ভয় কচ্ছে। আমি যাব না-- তুমি—।” ঠিক এমনি সময়ে শুভা “ঊষা দি!” বলিয়া সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং ননীবাবুকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, নির্ব্বাক অবস্থায় থমকিয়া দাঁড়াইল।

ননীবাবু ক্ষণকাল অন্তর্গূঢ় প্রবল স্মৃতির তাড়নায় স্তব্ধ হইয়া শুভার মুখের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দ্রুতপদে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। ননীবাবু শয়ন কক্ষে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঊষা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ননীবাবুর চরণে মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিল। অশ্রুজলে পদদ্বয় সিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া

দাঁড়াইল। শেষে স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ননীবাবু ধীরে ধীরে উষার মুখখানি উত্তোলন করিলেন এবং তাহার শীর্ণ, কম্পিত ঠোঁট দুইটি ধারণ করিয়া বলিলেন "ছিঃ! কেঁদনা। যাও, আমি মাঝে মাঝে মধুপুর গিয়ে তোমাকে দেখে আসব।"

স্বামীর সকল যুক্তি, নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে পালন করাই উষার অভ্যাস ছিল। তাহার মন সায় দিক আর নাই দিক, উষা কখনও প্রতিবাদ করিত না। কেবল মধুপুর যাইতেই সে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। উষা স্থির নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া থাকিয়া অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলিল "সপ্তাহে একদিন মধুপুর যাবে—? বল ঠিক যাবে?"

ননীবাবু কোমল কণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ— নিশ্চয় যাব।"

উষা অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিল "তবে আসি।" বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ননীবাবু ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিলেন। সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহার পর বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ননীবাবু একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কয়েক মিনিট নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, ননীবাবু উদভ্রান্ত উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—0—

উষাকে মধুপুর পাঠাইবার পর হইতেই, ননী-বাবুর অন্তরে এক নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। কি যেন ছিল, কি যেন নাই, এরূপ এক অনুভূতির

সংযোগে, তাঁহার মনের ভিতর প্রচুরতর উষ্মা জাগরিত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃত তথ্য ননীবাবু অন্তরে অন্তরে উপভোগ করিতে সক্ষম হইলেও, উহা প্রকাশ করিবার মত আত্মীয় বন্ধুর অভাবে, এবং সেই নির্ব্বাক নিঃশব্দ মানসিক যন্ত্রণার অংশী করিতে দ্বিতীয় ব্যাক্তিকে না পাইয়া,— সহানুভূতি বিহীন অসীম মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা নিজের বক্ষ-শোণিতে পলে পলে শোষিয়া লইয়া, কীট দংষ্ট ফলের মতই, আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

তাঁহার সেই আনন্দ লেশহীন অসীম নিস্পৃহ মূর্ত্তির ভিতর, এক প্রাণঘাতী বিষ জ্বালারই ছায়া অঙ্কিত হইতে লাগিল। তিনি যেন প্রাণের ভিতরকার অসহ্য যন্ত্রণাটাকে, দাবানলে পরিণত করিয়া, নীরবে সহ্য করিবার চেষ্টায়, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, ইহা তাঁহার মুখ দেখিলে যেন প্রতীয়মান হইত।

ননীবাবু উষাকে বিদায় করিয়া দিয়া, শুভার স্মৃতিতে ডুবিয়া থাকিবার মত একটা আকাঙ্ক্ষা,

অলক্ষিতে অন্তরের নিভৃত কোণে পোষণ করিয়া ছিলেন। হতাশ প্রেমিকের একমাত্র সম্বল— স্মৃতি-কণা টুকুন, তাঁহার আশা-হত-প্রাণ সরস করিবে, এরূপ একটা চিন্তা তিনি অন্তরে সংন্যস্ত করিয়া ছিলেন। কিন্তু শুভার ঔদাস্যপূর্ণ ভাব, যথাসাধ্য নির্লিপ্ততা প্রত্যক্ষ করিয়া, ননীবাবু একটা অন্তর্বিদ্ধ বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া, মুসড়িয়া পড়িলেন। ননীবাবু শুভার চলাফেরার বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। তাহার সেই সদা হাস্যময়ী ভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। ননীবাবুর নিকট হইতে সযত্নে আপনাকে সরাইয়া রাখিবার মত চেষ্টা শুভা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণপণে করিতেছিল। শুভা নীরব কর্ম্মীর মত, ননীবাবুর সমস্ত পরিচর্য্যা করিয়া যাইত, সময়োচিত প্রয়োজনীয় জিনিষ আহার্য্য ইত্যাদি বেশ্ সুশৃঙ্খলতার সহিত, তাঁহার করায়ত্ব করাইয়া দিত। কিন্তু ননীবাবু কর্ত্তৃক উত্থাপিত কোন প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সুধু সে "হ্যাঁ"—"না" করিয়াই, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, কক্ষান্তরে চলিয়া যাইত।

দৈবাৎ ননীবাবুর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ লাভ ঘটিলে, শুভার মুখ যেন বিদ্যুৎগতিতে আকর্ণ লাল হইয়া উঠিত। সে ত্বরিত গতিতে কক্ষান্তরে গমন করিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িত।

ননীবাবু শুভার এই অদ্ভুত চলাফেরার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া,— আপনাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেন। শুভার এই অসীম সংযমতা যেন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ-বিষে পরিণত হইত। তাহার লুকচুরিতে ভিমরুলের হুলের মতই ননীবাবুর অন্তর বিদ্ধ করিয়া, তাহাকে জ্বালাময় করিয়া তুলিত। এই নৈরাশ্যতার সহিত নিরুদ্যমতা সম পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া ননী-বাবুকে একেবারে হতভম্ব করিয়া ফেলিত।

শুভা সময় সময়, গতিহারার মত, তাহার স্নেহ বিজড়িত অপলক চক্ষুদ্বয় ননীবাবুর উপর বিন্যস্ত করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দহীন ভাবময় ভাষার সৃষ্টি করিয়া দিত! সেই দৃষ্টিতে ননীবাবুর অন্তরে অসীম প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া, অশনি ভরা

বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোকধারার মতই বিদগ্ধ করত। সূচের মত সেই জ্বালাময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহ্য করা যেন ননীবাবুর পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িত!

ননীবাবু দম দেওয়া কলের পুতুলের মত, নীরবে দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া যাইতেন। তাঁহার অভিমান ক্লিষ্ট অশান্তি-প্লাবন সমস্ত অন্তর জুড়িয়া, প্রবল কলরোলে মথিত করিতে থাকিত। তিনি তাহার হাত হইতে কোন মতেই অব্যাহতি লাভের সুযোগ পাইতেন না। ক্ষুব্ধ হতাশের তীব্র জ্বালা ননীবাবুর বক্ষ পিঞ্জরে প্রতিনিয়ত ধূঁ ধূঁ করিয়া জ্বলিতে থাকিত। তিনি ঝটিকার পূর্ব্বে অশনি-ভরা কাল মেঘের মতই গম্ভীর মূর্ত্তিতে, অতীত স্মৃতিটুকুন বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ননীবাবু অপরিস্ফুট অন্ধকার ছায়ায়, বারেন্দার আলেসার গায় হেলান দিয়া বসিয়া নানা চিন্তায় আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চিত্তে এলোমেলো অনেক কথাই উঠা নামা করিতে লাগিল। মস্তকোপরি

সুনীল আকাশের সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাজী অপেক্ষাও যেন অসংখ্য চিন্তার ধারা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিতে ছিল। ঠিক এমনি সময়ে অসিতবাবু তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া ডাকিলেন "ননি!"

ননীবাবু অসিত বাবুর অপ্রত্যাশিত আহ্বানে ভয়ানক রকম চমকিয়া উঠিলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই অসিতবাবুকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ধড়মরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এক অসীম দুশ্চিন্তায় তাহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুখ মণ্ডল একটু-খানি হইয়া শুকাইয়া গেল।

———*———

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অসিতবাবু ননীবাবুকে বসিতে অনুরোধ করিয়া, স্বয়ং পার্শ্বস্থ একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত ননীবাবুর মুখের প্রতি

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্মিত মুখে বলিলেন "ননি! আজ তোমার সাথে একটা পরামর্শ কত্তে এসেছি। তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত কত্তে এসেছি বলে মনে কিছু করোনা। তুমি যেরূপ পরিশ্রম করে আমার কারবারে উন্নতি সাধন কচ্ছ, এরূপ একজন হিতৈষী লোক খুব কপালের জোরেই মিলে থাকে।"

ননীবাবু অধীর আগ্রহে বলিলেন "সেরূপ বিশেষ কিছু বলে মনে হয় না— আপনার অনুগ্রহ পেয়ে আমি একটা দাঁড়াবার স্থান করে নিয়েছি। আপনার স্নেহ, যত্নের কথা জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বনা।"

অসিতবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন "তা তুমি বল্‌তে পার তবে'আমি এ সমস্ত কোন গুণের অধিকারী বলে মনে করিনা। তোমাকে এমন কিছু করে উঠ্‌তে পারিনি, যাতে তুমি এতটা বলবার অবকাশ পেতে পার। যাক্ সে কথা,— আসল কথাটা হচ্ছে এই,— শুভার বয়স হয়েছে,— বিবাহ দিতে তা'র গর্ভধারিণী নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি এতদিন নিতান্ত উদাসীন ছিলাম। খুব অল্প

বয়সে, সংসার ঘর করবার উপযুক্ত না হ'তে, মেয়েদের বিবাহ দিবার সপক্ষে আমার মত ছিলই না। তা'র পর তোমাকে বর নির্ব্বচন করবার পর এক বিভ্রাট উপস্থিত হয়ে গেল। সম্প্রতি একটা ভাল সম্বন্ধ হাতে এসেছে। শুভাও এতদিন বিবাহে অমত প্রকাশ করে,— কোনই সম্বন্ধ সুস্থির কত্তে দেয় নি। এখন বিবাহের সপক্ষে সে মত দিয়েছে। এই সুবর্ণ সুযোগ প্রত্যাখান করা আমি অযৌক্তিক মনে করি। আর আমাদের বয়স ত বাড়ছে বৈ কমছে না! এখন যদি এই একমাত্র মেয়ের সুবন্দোবস্ত না করি,— তবে হঠাৎ মরে গেলে, সমস্তই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এবিষয়ে তোমার কি মত?"

অসিতবাবুর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ননীবাবুর ব্যগ্রতা সহসা ঘোর নৈরাশ্যের তীরে আছাড় খাইয়া পড়িল। স্রোতাহত কুসুম দামের মতই তিনি নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনের ভিতর একটা ভীষণ বিদ্রোহের ঝড়ের হাওয়া অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে তাঁহার

চোখের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাঁহার পায়ের তলার মাটি দুলিয়া উঠিল। অতিকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া ননীবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন "সে মন্দ পরামর্শ নয়। তবে একটি সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিতে হবে।"

অসিতবাবু স্মিতমুখে বলিলেন "ফরিদপুর জিলার অন্তঃর্গত শোভানগরের শরৎবাবু একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার একমাত্র পুত্র অমিয়ভূষণের সহিত বিয়ের প্রস্তাব চল্‌ছে। শরৎবাবু কলিকাতা ব্যবসা বাণিজ্য করে বিস্তর সম্পত্তি করেছেন। কলিকাতা পাঁচ খানা বড় বড় বাড়ী করেছেন। একটা কারখানা করে বহু লোকের অন্ন সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। কারখানার আয়ও বিস্তর, ধর গিয়ে তোমার নানা জিনিষই এতে তৈয়ার হচ্ছে। ছেলেটি বি, এ পাশ করে ঐ কারখানার ভার গ্রহণ করে, বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা কচ্ছে। সেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে যে কলিকাতা গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলুম, সেই সময় অমিয়, শুভাকে

দেখেছিল। সে শুভাকে খুবই পছন্দ করেছে, আর বলতে লজ্জা করে কি হবে? শুভা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কত্তে সে প্রস্তুত নয়,— তাও জানিয়েছে। কার নির্ব্বন্ধ যে কোথায়, কে বলতে পারে? ঠিক এমনি সময়েই শুভা বিয়ের সপক্ষে মত দিয়েছে, দেখা যাক কি হয়?”

অসিতবাবুর মুখ নিঃসৃত কথা কয়টি শ্রবণ করিয়া ননীবাবু ব্যাকুলতায় অধীর-দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার অস্বাভাবিক রাঙ্গা মুখে আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চোখ দুইটি যেন ভয়ানক রকম জ্বলিতে লাগিল। শুভা বিবাহে মত দিয়াছে, ইহা যেন একটা আশ্চর্য্য ধ্বনীর মতই তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। এই কথা কয়টির প্রতিধ্বনী ননীবাবুর কাণে অনবরত ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর সেই শব্দ যেন আগুন হইয়া ধোঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। শুভার স্নেহ নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার উপর সংন্যস্ত মনে করিয়া, তাঁহার পায়ের অঙ্গুলের উপর হইতে মস্তকের চুলের মূলদেশ পর্য্যন্ত, যেন একটা

ভীষণ ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ননীবাবু একটা আর্তশ্বাস মোচন করিলেন এবং বুকের যন্ত্রণার তীব্র হাহাকার ভরা অগ্নিময় ঝটিকা একটুকু প্রশমিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন "এ বিষয়ে আমার খুবই সহানুভূতি রয়েছে। ব্যবসা বণিজ্য ছাড়া দেশের উপায় নেই। এ ছেলের সাথে বিবাহ হলে বেশ ভালই হবে বলে মনে হয়।"

অসিতবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন "তা বটেই তো। আমি এরূপ পাত্রেরই খোঁজ কচ্ছিলুম। আজ কাল পাশ টাশের কোনই বিশ্বাস নেই। পাশের সঙ্গে সঙ্গে কেরাণী দলেরই পুষ্টি সাধন হচ্ছে। বেকারের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে! ছেলেরা সাধারণতঃ বাপ, দাদার পয়সায় দিন কয়েক বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিয়ে, ডিগ্রির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শেষটায় সেই কেরাণীগিরি—তাও কি এমনি হয়? কত সুপারিস,— কত হাঁটা হাঁটি করে, চোখে ধূঁ ধূঁ মরুর সৃষ্টি করে, তবে ত্রিশ টাকার পথ করে নিতে সক্ষম হয়। তাই আমি এই ছেলেটিকেই

মনোনীত করেছি।”

নবীবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চিন্তাস্রোত শতমুখী হইয়া তাঁহার অন্তরের সমস্ত দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দিল। ননীবাবুকে নীরব দেখিয়া অসিতবাবু ধীরস্বরে বলিলেন। “দেখ ননি! শুভার কেন এতদিন মত হয়নি, তা আমি বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছি। সে যা চেয়েছিল তা ত হবার উপায় নেই, সেটা হল আমাদের অদৃষ্টের দোষ। তবে শুভার এই মত থাকতে থাকতে তাকে পাত্রস্থ কত্তে পারলে একটুকু নিশ্চিন্ত হতে পারি।”

ননীবাবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন “কোনই বাঁধা বিঘ্নের কারণ দেখি না। পণের টাকা দিতে আপনি অশক্ত নন। তারপর দান সামগ্রীর যে আয়োজন—তা তা'রা হয় ত ধারণাও কত্তে পারবে না।”

অসিতবাবু একটুকু নীরবে থাকিয়া বলিলেন “তোমাকে আমি আপন ছেলের মতই দেখ্‌ছি।

তোমার ব্যবহার ও কার্য্য তৎপরতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি মনে করেছি শুভার বিয়ে দিয়ে, এখানকার কারবারের ভার তোমার উপর অর্পণ করে---কাশী বাসী হব। দেখি কতটা কার্য্যে পরিণতঃ কত্তে পারি।”

ননীবাবু মস্তক উত্তোলন করিয়া কৃতজ্ঞতা সূচক দৃষ্টি অসিতবাবুর প্রতি নিবদ্ধ করিলেন। শেষে আনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

অতঃপর সাংসারিক বহু জটিল বিষয়ের পরামর্শ করিয়া অসিতবাবু কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

——0——

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অসিতবাবু চলিয়া গেলে, ননীবাবু নানা চিন্তায় আপনাকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন। তিনি শুভার অপ্রত্যাশীত আচরণের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। একি দৈব

বিড়ম্বনা,— না প্রকৃতির প্রতিশোধ ! ননীবাবুর চক্ষে জল সহজে আসিত না,— আসিলেও তাহা ঝড়িয়া পড়িত না,— কিন্তু আজ তাঁহার চোখের জল, চোখের মধ্যে ধরা থাকিল না। যেন দুকূল ছাপাইয়া অসীম প্লাবনের সৃষ্টি কবিল। এই দুর্ব্বলতার জন্য তিনি ক্রমে অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। শেষে অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া স্বাস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

রাত্রি আটটায় ননীবাবু আপনার শয়ন কক্ষের টেবিলের নিকট যাইয়া, একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। এক খানা ইংরাজী পুস্তক টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিন্তু মনঃসংযোগের অভাবে পুস্তকের কোন কথাই বোধ-গম্য করিতে পারিলেন না। ননীবাবু হতাশপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া একটা ভীত, কম্পিত ও ম্রীয়মান ভাব টানিয়া আনিয়া, আপনাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তিনি ধীরে ধীরে শয্যায় যাইয়া, মুদ্রিত নেত্রে ভাবিতে লাগিলেন — ছিঃ শুভা আমার কে ? আমার উষা রয়েছে— সেইত আমার আপনার জন। উষার অন্তর প্লাবি

স্নেহের বন্যার নিকট এসমস্ত আকাঙ্ক্ষার মোহ যে নিতান্ত তুচ্ছ! ঊষার অন্তর কোমল, ছলনা চাতুরীর পূতগন্ধ বিহীন,— ফুল্ল কুসুমবৎ সুহাসিনী সেই ঊষাইত আমার রয়েছে। তবে আমি মিথ্যা মরুর মৃগ তৃষ্ণিকার পিছে ঘুরে, আপনাকে এমনি অসহায়ের ন্যায় শত অশান্তির কষাঘাতে জর্জ্জরিত কত্তে চাচ্ছি কেন? ঊষার ভিতর যা আছে, আর ত কোথায় তা খুঁজে পাই না! তা'কে না বুঝে কত না কষ্ট দিয়েছে! তা'র প্রায়শ্চিত্ত যে আমাকে কত্তেই হ'বে! এতদিন বুঝ্তে পারিনি— তা'র স্থান কত উচ্চে,— তাঁ'র অন্তর্নিহিত প্রেমধারা প্রবাহিত করে, সে আমাকে বেষ্টন কর্‌বার জন্য কত না নির্য্যাতন সহ্য কচ্ছে! কত অশ্রু বিসর্জ্জন করে আপনাকে সিক্ত করেছে,— তা'র ত কোনই খোঁজ নিতে আমি চাইনি। না,— শুভার কথা আর মনেও স্থান দোব না। শুভার বিবাহে আমিই অগ্রগামী হয়ে শুভ কর্ম্মে সহায়তা কর্‌ব। শুভা ঈপ্সিত বর লাভ করে যদি সুখী হয়— তবে

কেন আমি তা'র সুখের পথ আগ্‌লে থাক্‌ব ! আমার সব আছে,—সংসার ঘর কর্‌বার উপযুক্ত গৃহিনী পেয়েছি। শুভার কি আছে ? কি আশায় শুভা একাকী এই বহু বর্ষব্যাপি জীবন ক্ষেপণ করবে ? বহু সম্পত্তির অধিকারিণী হলেও এই সঙ্গীবিহীন জীবন যাপন করা কতটা সহজ সাধ্য হ'বে তাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য বলে মনে হয়। যদি তা চিন্তা কত্তে না পারি, তবে আমাকে ভয়ানক স্বার্থপর বলে সকলের নিকট মাথা নোয়াতে হ'বে। নিজের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত কত্তে যেয়ে, একটি অসহায়া বালিকাকে বিপন্ন কত্তে গেলে, লোকচক্ষে নিতান্ত হীন বলেই প্রতিপন্ন হ'তে হ'বে। শুভা তা'র শান্তির পথ খুঁজে নিতে চাচ্ছে বলে, তাকে দোষী সাব্যস্ত কত্তে চেষ্টা করার মত, হীন প্রবৃত্তি আর কি হ'তে পারে ? তাকে সুখী দেখ্‌লে যদি প্রাণে তৃপ্তি টেনে নিতে না পারি, তবে তার প্রতি আমার ভালবাসা,— স্বধু একটা মোহ বৈ ত নয় ! হীন মোহজাল ছিন্ন করে, মনের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সংযত করে,

মানুষের মত আমাকে দাঁড়াতেই হ'বে। এ যদি না পারি তবে বর্ব্বরে আর আমাতে প্রভেদ কি? না—শুভা অপরের হবে এ যে ভাবতে আমাকে পাগল করে দেয়,—শুভা অমিয়ভূষণের—।"

ননীবাবুর চিন্তাস্রোতে বাঁধা দিয়া ঠিক সেই সময় শুভা মিষ্টি সামগ্রী পূর্ণ এক থালা হস্তে করিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে ননীবাবুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "দাদাবাবু! আজ কিছুই খাবেন না কেন?" বলিয়া শুভা টেবিলের একধারে, আলোর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল; শেষে থালাখানা টেবিলের উপর সংরক্ষণ করিয়া, ননীবাবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার মুখের সেই মিষ্টী স্নিগ্ধ স্মিত হাস্যটুকুন আর নাই। সে অপলক নেত্রে ননীবাবুর প্রতি তাকাইয়া রহিল।

আজ বহুদিন পরে শুভাকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া, এবং সেই পুরাতন "দাদাবাবু!" কথাটি উচ্চারণ করিতে দেখিয়া, ননীবাবু একেবারে আড়ষ্ট অভিভূতবৎ চাহিয়া রহিলেন। শেষে অতি কষ্টে

আত্মগোপন করিয়া, শয্যার উপর উপবেশন করিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া, সহসা আর্ত্তনাদের মতই বলিয়া উঠিলেন "আমার শরীরটা আজ ভাল নেই,— আজ কিছু খাব না।"

শুভা নিতান্ত সহজভাবে উত্তর করিল "তা কি হয়— আমি খাবার এনেছি আজ কিছু খেতেই হবে।"

ননীবাবু সংযুক্ত ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত করিয়া শান্তভাবে বলিলেন "আজ কিছু খেলে আমার অসুখ করবে। উপুস দিলে ভাল হবে বলে মনে হয়।"

শুভা সর্ব্বাঙ্গ হইতে সমস্ত লজ্জার খোলস খুলিয়া দিয়া সহজভাবে বলিতে লাগিল "আমি তোমার অন্তরের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছি বলেই আজ অযাচিত ভাবে, তোমর নিকট এসেছি।" বাবার সাথে তোমাব যে সমস্ত কথা হয়েছে,— আমি সমস্তই ঐ পাশের কামরায় বসে শুনেছি। ইহাই তোমার অসুখের কারণ নয় কি? এরপর আজ যদি তুমি উপুস থাক, তবে তাঁরা কি ভাব্‌বেন? তোমার অপযশ

হলে আমি যে সহ্য করতে পারি না।"

শুভার সংকোচহীন ব্যবহারে ননীবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার বুকের ভিতর গভীর যন্ত্রণা তীব্রশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। ননীবাবু এক অসীম শক্তি শরীরের শিরা ও উপশিরায় পুঞ্জিভূত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "এটা কি তোমার অন্তরের কথা? শুভা! আমি আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে সাহসী হয়েছি। প্রকৃত উত্তর দিবে কি?"

শুভা নিতান্ত সহজ ও দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "তা তুমি জিজ্ঞাসা কত্তে পার। আমি কিছুই গোপন করব না। আর গোপন করেই বা কি ফল?"

শুভার প্রতি কথার ঝাঁজে ননীবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ননীবাবু অতি কষ্টে অন্তরের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "তুমি বিবাহে মত দিয়েছ?"

শুভা ননীবাবুর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "হ্যাঁ দিয়েছি। তুমিও ত

তোমার সম্মতি জানিয়েছ।”

ননীবাবু জড়িত কণ্ঠে বলিলেন “তা না দিয়ে কি করি, আমার মতামতের জন্য কোন কাজ আটকাবার সম্ভাবনা নেই বলেই ত মত দিয়েছি। আর বিশেষতঃ নিতান্ত স্বার্থান্ধ হয়ে তোমার জীবনের সুখ শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করবার সপক্ষে দাঁড়াতে মন যে চাইছে না। তুমি সুখী হলেই আমি সুখী হব,—এ ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা যেন মনে স্থান না পায় তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থণা কচ্ছি।”

শুভা ননীবাবুর কথার ঝাঁজে বিচলিত হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে ননীবাবুর শয্যার নিকটে আসিয়া অপলক দৃষ্টিতে ননীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় পনর মিনিট কাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুভা তাহার উদ্বেগ শঙ্কিত চিত্ত অনেকখানি সংযত করিয়া লইল। শেষে দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল আমার সুখের কথা বল্‌ছ? তা এ জীবনে সুখ লাভের আশা নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। তোমাকে সকল কথা খুলে বল্‌ব বলেই আজ তোমার সম্মুখে এসেছি। তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আমি একেবারে হতাশ হয়েছি। স্ত্রীলোক অবলা বলে তোমরা বক্তৃতা করে থাক,—কিন্তু তাদের ভিতর যতটুকুন সহ্য করবার শক্তি রয়েছে শিক্ষিত হয়ে অসীম শক্তির আধকারী হয়ে, তোমাদের ভিতর তার অভাব দেখ্‌লে, আমাদের পক্ষে সংযমী হবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র! তুমি আমাকে পাবার জন্য একটি নিরপরাধিনী বালিকার প্রতি যে কি অন্যায় উৎপীড়ন করেছ,—তা কখনও ভেবে দেখেছ কি? বিবাহ মন্ত্রে তুমি অগ্নি সাক্ষী করে, তাকে সুখ দুঃখের

অংশী করে নিয়েছ। দুর্দ্দিনে রক্ষা কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছ,—এখন বিনা দোষে নির্য্যাতন করা তোমার মত শিক্ষিত লোকের আদর্শ কিনা, ভেবে দেখ। ভালবাসা পবিত্র বৃত্তি, এর ভিতর দিয়েই দেবত্বে পৌঁছান যায়। ভালবাসা মানুষকে কর্ত্তব্য চ্যুত করলে,—সেই পবিত্র শব্দের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকে না। তোমরা যদি এতটা ধৈর্য্যচ্যুত হও, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? ভালবাসাকে ভোগ বিলাসের সামগ্রী বলে বরণ করলে, একটা পিচ্ছিল পথ সম্মুখে বিস্তৃত হয়ে,—সমস্ত পবিত্র জ্যোতি নষ্ট করে দেয়।" বলিয়া শুভা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শুভা অতি কষ্টে অশ্রুধারা সংবরণ করিয়া বাষ্প গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে আবার বলিতে লাগিল, আমি কেন বিবাহে মত দিয়েছি— তা তোমাকে জানাব বলেই আজ সমস্ত লজ্জার বাঁধ মুক্ত করে দিয়েছি। আজ না বললে আরত সময় হবে না,—মনের কথা মনের ভিতরই পুঞ্জিভূত হয়ে আমাকে দগ্ধ কর্ত্তে

থাক্‌বে ! যৌবনের প্রারম্ভে, যখন সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে করে ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারে এসে দাঁড়ালুম, তখন কোন্ দুষ্ট গ্রহের দোষে জানিনা,— তোমার সাথে সাক্ষাৎ হল। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে অজ্ঞাতসারে তোমার পায়ে বিকিয়ে দিলুম। তারপর যখন তোমার দুর্ঘটনার সমস্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল,— তখনই বুঝলুম আমার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে। এতেও নিরাশ না হয়ে, মনে মনে সংকল্প করেছিলুম— তোমার পদছায়া হৃদয়ে অঙ্কিত করে, অন্তরের সমস্ত শক্তি একত্রজড় করে, তোমার উদ্দেশে একমনে ধ্যান করব। তোমার অতুলনীয় মূর্ত্তি স্মৃতিপথে জাগ্রত রেখে তোমাতেই তন্ময় হয়ে থাকব। তা তুমি হ'তে দিলে কৈ ? আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সকলের করায়ত্ত না হলেও,— তা'র ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাক্‌বার অধিকার সকলেরই রয়েছে। কাম্য বস্তু জন্মান্তরেও লাভ হবে এই আশায় নীরব সাধনায়ও তৃপ্তি রয়েছে। কিন্তু তোমার অধৈর্য্যতা ও ছেলে মানুষী

কাণ্ড দেখে, ব্যর্থতার নির্ম্মম বেদনাকে স্বইচ্ছায় বরণ করে, বিবাহে মত দিয়েছি। তোমাকে পাবার মত, আকাঙ্ক্ষা বুকে পোষণ করে থাক্‌লেও,— স্বার্থ-পরতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকি। নিজের তৃপ্তির জন্য— উষা দিদির উপর এতবড় অন্যায় অত্যাচারের প্রশ্রয় দিবার মত বাসনা লয়ে, জীবন ধারণ কত্তে চাই না। দূরে বসে তেমার ছবিখানি শূন্য হৃদয়ে জাগায়ে তুলে,— জগতের সমস্ত অশান্তি ভুল্‌তে চেষ্টা করব বলে মনে করেছিলুম ;— কিন্তু তুমি জোর করে আমাকে মনের কামনার বিরুদ্ধে চালিত কত্তে বাধ্য করেছ। এর জন্য দায়ী তুমি। আমার অন্যত্র বিয়ে হলে, হয়ত তুমি খাটি পথ ধরবে,— একটা মস্ত প্রতিবন্ধক সম্মুখে খাড়া করালে হয়ত তুমি আপনাকে সংযত করে নিবে,— এই একমাত্র আশায়, আমি বিবাহে মত দিয়েছি। এখনত আর ফিরাবার উপায় নেই। তবে জেনো,— আমি জন সমাজে— অন্ততঃ নিজের বিবেকের নিকট কলঙ্কিনী হলেও,— এক জনের সুখ শান্তি ফিরাইয়া দিবার ফলে আমার

অন্তরের তৃপ্তি ফিরে পেলেও পেতে পারি। যদি তা না হয়— এর ফলে পূতি গন্ধময় নরকে পড়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করলেও— আমার অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে বলে মনে করব। এ জীবনে তোমার আসন অন্তর হ'তে ঠেলে ফেলতে পারব না। আমার অন্তরের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করলেই, তোমার অতুলনীয় মূর্ত্তি আমার বক্ষে ফুটে উঠে। তোমার স্মৃতি নিয়ে আমি জগৎ সংসার ভুলে যাই,— এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে,— আশার উজ্জ্বল আলোকে আমার হৃদয় মন ভরে উঠে। তখন এক মোহ-মদিরায় আমাকে উন্মত্ত করে তোলে। এতটা হৃদয় ভার নিয়ে— আমি আপনাকে সংযত করে রেখে-ছিলুম। বাহিরে নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়েছিলুম। আর তুমি পুরুষ হয়ে, ব্যর্থতার চিন্তায় এতটা কেলেঙ্কারী কত্তে একবারও চিন্তা কর না? তোমার অপযশে আমার বুক ভেঙ্গে পড়ে,— তোমাকে এতটা হাল্কা দেখলে এক অসহ্য যন্ত্রণায় আমাকে দগ্ধ কত্তে থাকে, তা'র হিসাব তুমি কতটুকুন কত্তে চেষ্টা কর?

অনেক কথা বলে ফেললুম, আমাকে ক্ষমা করো।" বলিয়া শুভা নয়নের প্রবল অশ্রুধারা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে,— উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত না হইতেই শুভা আবার ননীবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সহজ ভাবে বলিল "আমার এই শেষ অনুরোধটি রাখবে ?"

ননীবাবু জড়িতকণ্ঠে বলিল "কি করতে হবে— বল।"

শুভা মিষ্টি সামগ্রী পূর্ণ থালাখানি ননীবাবুর সম্মুখে ধরিয়া বলিল "এ-সমস্ত জল খাবার গুলি তোমাকে খেতেই হবে।"

ননীবাবু মন্ত্র চালিতবৎ ধীরে ধীরে থালার প্রায় অর্দ্ধেক সামগ্রী গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন "শুভা ! অনেক খেয়েছি— আর খেতে অনুরোধ কর না।"

শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত ননীবাবুর প্রতি চকিত দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ননীবাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে বালিশের উপর মস্তক

খুঁজিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, চতুর্দ্দিক একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ননাবাবু অসহ্য মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় শয্যা হইতে উঠিয়া,—টেবিলের নিকট যাইয়া বসিলেন এবং বিনিদ্র অবস্থায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া দিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ননীবাবু অতি প্রত্যূষে বারান্দায় একখানা আরাম কেদারায় যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার মুখ চোখের ভাব প্রায় খুনী আসামীর ভয়াবহ প্রতিলিপির মতই প্রকটিত হইতে লাগিল। শুভার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ প্রতিকথার ঝাঁজে, এক অসীম ধিক্কারে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। বাস্তব জগতে পুরুষোচিত বিচার শক্তি ও সংযমের অভাবে এতটা দুর্ব্বলতা তাঁহার ভিতর যে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ

করিয়াছে, তাহা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মর্ম্মের বাঁধন ততই প্রচণ্ড বেগে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল।

তিনি বসিয়া বসিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন সামান্য বালিকার পক্ষে যাহা সম্ভবপর, তাহা আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন করানটা ঠিক হয় নি। এতটা লঘুচিত্ত নিয়ে জগতে আমি কতটুকুন সফলতা লাভ করার দাবী কত্তে পারি? তা' পাওয়া নিতান্ত অন্যায়, এবং যা' পেলে অপর একজন নিরপরাধিনীর জীবন বিপন্ন করা ছাড়া উপায় নেই,—এরূপ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মত ছেলে মানুষী কাজ আর কি হ'তে পারে? ছিঃ! এতদিন আমি কি অন্যায় অনুষ্ঠানের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছিলুম! লোকে বলে কামে ভোগের স্পৃহাই বাড়িয়ে দেয়, আর ত্যাগের ভিতর দিয়াই ভালবাসার খাঁটী তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অমোঘ সত্যাকেই আমার জীবনের সম্বল করে নিতে হবে। শুভাকে লাভ করবার মত স্পৃহা

অন্তরের প্রতি পর্দা হতে মুছে ফেলে, নূতন ভাবে জীবন পরিচালিত করাতেই হবে। নির্লিপ্ততার ভাব টেনে এনে, শুভাকে বুঝাতে হবে, আমার জীবনের মিথ্যা মোহ কেটে গেছে, এবং জীবনের ধারাগুলি নূতন ভাবে প্রবর্ত্তন করতে সক্ষম হয়েছি। শুভার বিবাহ যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হতে পারে, তার জন্য আমাকে সাধ্য মত চেষ্টা ও তৎপরতা দেখাতে হবে। আমার উষা— সুন্দরী কিশোরী, যৌবনের নিটোল সৌন্দর্য্যের আধার,— তার প্রাপ্য সমস্ত সুখ শান্তি তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। এত দিন এক মিথ্যা মোহের পিছনে ছুটে, তা'র জীবনের দুষ্টগ্রহ সেজে, তা'র দিনগুলি ঘোর দুর্বিবপাকের মধ্যে জড়িত করে, নিতান্ত বিড়ম্বনাময় করে তুলে ছিলুম। এর জন্য ভগবানের প্রেরিত যে কোন শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। হে দয়াময়! আমাকে শক্তি দাও,— আমার কর্ম্মকুশলতা ফিরিয়ে দিয়ে, সফলতার সীমানায় এনে দাঁড় করিয়ে দাও,— এক মাত্র ত্যাগের ভিতর দিয়েই

যেন অসীম মিলনের দিকে ছুটে যেতে পারি !

এ সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে ননীবাবু একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আকাশ, ধরণী জীবজন্তু, লতাগুল্ম সমস্তই যেন তাঁহাব বাস্তব কল্পনার ভিতর মিশিয়া যাইয়া, একাকার হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন একটা মস্ত গুরু ভার মস্তক হইতে নামাইয়া ফেলিয়া, নূতন জগতের সন্ধানে ছুটিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। বাড়ীতে যখন আগুন লাগে, গৃহস্থ যেমন চিন্তা ক্লিষ্ট মুখ লইয়া, অধীর আগ্রহে তাহার আশ্রয় স্থল ক্ষুদ্র কুটীর খানা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করে, ননীবাবুও জীবনের এই ঈপ্সিত পন্থা তেমনি আগ্রহের সহিত আকড়াইয়া ধরিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার যতটুকুন বিবেক বুদ্ধি সঞ্চিত ছিল, সেই সমস্ত যেন একত্র করিয়া, মিথ্যা মোহের গণ্ডী ছাড়াইবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে কৃত সংকল্প হইলেন।

ইহার পর আরও পনর দিন কাটিয়া গিয়াছে।

ইহার মধ্যেই ননীবাবু বিশেষ দৃঢ়তার সহিত স্বীয় মনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। সমস্ত দিন কয়লার খনির কার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতেন। ভোর সাত-টায় কাজে যোগ দান করিতেন এবং বেলা বারটার পর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই স্নানাহার শেষ করিয়া ফেলিতেন। ক্রমে দৈপ্রহরিক নিদ্রায় অভ্যাস কাটাইয়া ফেলিলেন। প্রতিদিন ভোজনান্তে অসিতবাবুর সহিত খনি সম্পর্কিত প্রয়ো-জনীয় বিষয়ের পরামর্শ করিয়া, আবার কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া জলযোগ করিতেন এবং রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সহরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। রাত্রি নয়টার ভিতর নৈশ ভোজন শেষ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইতেন। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, শুভার সহিত আবশ্যকীয় কাজের কথা,— যাহা না বলিলেই নয়, তাহাই নিতান্ত সহজ ভাবে বলিয়া যাইতেন। শুভা ননীবাবুর এই নির্লিপ্ত ভাব লক্ষ্য

করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

রবিবার। বেলা একটায় ননীবাবু কার্য্যস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঠিক এমনি সময় চাকর একখানা টেলিগ্রাম আনিয়া, তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল। ননীবাবু টেলিগ্রাম খানা খুলিয়া, এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া ফেলিলেন। উহাতে লিখা ছিল— "গত রাত্রিতে ঊষা নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। ঊষা ও নবজাত শিশু ভালই আছে।"

ননীবাবু টেলিগ্রাম খানা অসিতবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়া, একখানা চেয়ারে যাইয়া উপবেশন করিলেন। প্রায় পনর মিনিট সময় অতিবাহিত না হইতেই, অসিতবাবু ননীবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ননীবাবু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই অসিত বাবুর শয়ন কক্ষে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী ননীবাবুকে সম্মুখে দেখিয়া, একগাল হাসিয়া বলিলেন, "এস বাবা! এই শুভ সংবাদে যে কতটা আনন্দিত হয়েছি,—তা মুখে প্রকাশ করা এক রকম অসম্ভব

বলেই মনে হচ্ছে। এখন এদের দীর্ঘজীবন ভগবানের নিকট কামনা কচ্ছি।”

অসিতবাবু স্মিত-মুখে বলিলেন “তুমি আজ কাজে যেও না,— এবেলা কাজে না গেলে, কোনই ক্ষতি হবে না।”

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গৃহিণী দশ টাকার দুইখানা নোট বাহির করিয়া ননীবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন এবং স্মিত-মুখে বলিলেন “ননি! এদিয়ে দোকান হতে ভাল মিষ্টি আনিয়ে দাও,—বাসার সকলকে আজ মিষ্টি মুখ করাতে হবে। আজ আমাদের সুপ্রভাতই বল্‌তে হবে।”

ননীবাবু নত মস্তকে কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া রহিলেন। অসিতবাবু দৃঢ়স্বরে, ননীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “শুভার বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসে কিছুতেই হতে পারে না। এই বিবাহে ঊষা উপস্থিত হতে না পার্‌লে—আমার বিশেষ ক্ষোভের কারণ হবে। বৈশাখ মাসেই বিবাহের দিন ধার্য্য কর্ত্তে হবে। বর-কর্ত্তাকে ইহা স্বীকৃত করাতেই

হবে। আমি আজই তাঁদের নিকট চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি ফাল্গুন মাসে ঊষাকে এখানে নিয়ে আস্‌বে। বৈশাখের প্রথমভাগে বিবাহের দিন ধার্য্য করলেই হ'বে এখন।"

গৃহিণীও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "ঊষা আমার ঘরের মেয়ের মত,— তাকে বাদ দিয়ে কিছুতেই এই বিবাহের অনুষ্ঠান হ'তে পারে না। আমার এই একমাত্র কাজ, বৈশাখে দিন ধার্য্য হলে কোনই অসুবিধার কারণ হবে না। এটা যে প্রকারেই হক, কত্তেই হবে।"

ননীবাবু আর কোনই প্রতিবাদ না করিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বর-কর্ত্তা শরৎবাবুর সম্মতি লইয়া, অসিতবাবু বিবাহের দিন ১০ই বৈশাখ নির্দ্ধারিত করিলেন।

অসিতবাবুর একান্ত অনুরোধে, ননীবাবু ঊষাকে বৈশাখের প্রথম ভাগে, মধুপুর হইতে আনিয়াছিলেন। ঊষা, গৃহিণীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, বিবাহের কাজে সহায়তা করিতে লাগিল।

অসিতবাবু বিবাহে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ের আনুমানিক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া,— সমস্ত বন্দোবস্তের ভার ননীবাবুর উপর অর্পণ করিলেন। ননীবাবু হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে, বিবাহের সমস্ত আয়োজনের ভার গ্রহণ করিয়া, সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সমধা করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। দান সামগ্রীর, বেশ ভূষার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ, ননীবাবু কলিকাতা হইতে স্বয়ং পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিলেন। অতিথি, অভ্যাগত, বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও বরযাত্রীদিকের বাস উপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, ননীবাবু বিশেষ পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত করাইয়া ফেলিলেন। ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট, ব্যাণ্ডপার্টি, থিয়েটার, বায়োস্‌কোপ্ প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। অসিতবাবু

ননীবাবুর কার্য্যতৎপরতা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

শুভা এই বিরাট ব্যাপারের হাঙ্গামার ভিতর, আপনাকে নিতান্ত নির্লিপ্ততার পরিচয় দিতে লাগিল। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেও যেন অস্বাস্তি বোধ করিত। ননীবাবুর ছেলেকে কোলে করিয়া বেড়ান, ঘুম পাড়ান, ও অন্যান্য পরিচর্য্যায় শুভা সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিত।

আজ ১০ই বৈশাখ। ভোর রাত্রি হইতেই নহবৎ বাজিয়া উঠিয়াছিল। বাঁশীর করুণ ধ্বনী, সমীরণের সহিত গা মিশাইয়া দিয়া, যেন মাঙ্গলিক বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। ক্রমে রবি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গগনের ঊর্দ্ধসীমায় আরোহণ করিলেন। ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। ক্লাইয়োনেটের করুণ সুরে, সুদূর প্রান্তর প্রতিধ্বনীত হইতে লাগিল। লোকের কল-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

বেলা তিনটার ট্রেনে বর-কর্ত্তার শুভাগমন হইবে। দুইটা বাজিতেই ননীবাবু বেশভূষা পরি-

বর্ত্তন করিয়া, বর-কর্ত্তাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গেটের সম্মুখে মটর গাড়ী দাঁড়াইয়া তাঁহারি প্রতীক্ষা করিতেছিল। ননীবাবু অসিত বাবুর সহিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের পরামর্শ শেষ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইতেই, টেলিগ্রাম পিয়ন একখানা টেলিগ্রাম আনিয়া অসিতবাবুর হস্তে প্রদান করিল। অসিতবাবু টেলিগ্রাম খানা পাঠ করিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। টেলিগ্রামে লিখা ছিল "বর অমিয়ভূষণ গত রাত্রিতে কলেরায় জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন— তাহাই করিতে পারেন।"

ননীবাবু টেলিগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া, একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন এবং পার্শ্বের চেয়ারে যাইয়া উপবেশন করিলেন। মুহূর্ত্তে এই ভীষণ সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই অশুভ সংবাদে নবাগত আত্মীয় বান্ধবের মুখ কালিমাবৃত হইল। গৃহিনী শয্যায় আশ্রয় লইলেন— এবং মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় চক্ষের জলের বাঁধ ছাড়িয়া দিলেন।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ননীবাবু আপন শয়ন কক্ষে, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে উপবেশন করিয়া, আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। একটা বুক ভাঙ্গা হতাশে তাঁহার সমস্ত বক্ষ আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইয়া ফেলিল। থাকিয়া থাকিয়া, মেঘের বুক চিড়িয়া, বিদ্যুতের দীপ্তমান আলো, জ্বলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এমনি সময়ে ঊষা উদ্বেগ উৎকণ্ঠিত চিত্তভার লইয়া ননীবাবুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং স্বামীর মস্তক স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "সুধু ভেবে মন খারাপ করলে কি হবে,— বিপদ হতে উদ্ধার হবার একটা পন্থা বেড় কত্তেই হবে। ওদের অবস্থা যেরূপ হয়েছে,— তাতে এক ভয়ানক বিপদের আশঙ্কাই সূচীত হচ্ছে।"

ননীবাবু ধীরে ধীরে ঊষার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিল "ওদের বিপদে আমাদেরও বিপদ। এরূপ হিতৈষী লোক এসংসারে আমাদের আর কে আছে? এ বিপদে উদ্ধার

পাবার মত কোন পথই খুঁজে বের কত্তে পাচ্ছি না। আসানসোলের মত জায়গায়, কিছুই হয়ে উঠ্‌বার উপায় নেই।”

ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া নম্রস্বরে বলিল “উপায় আছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তবে আমার প্রস্তাব যদি তুমি অনুমোদন কর, এবং সেই মতে কাজ কত্তে প্রস্তুত হও,—তবে সমস্ত গোলযোগ মিটাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।”

ননীবাবু আগ্রহাতিশয্যে কয়েক মুহূর্ত্ত ঊষার মুখের প্রতি তাকাইয়া আর্ত্তনাদের স্বরেই বলিলেন “এ বিপদ হতে উদ্ধার পাবার মত কি কাজ আমি কত্তে পারি,— তাত ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। যদি সেই কাজ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব না হয়, তবে অবশ্য কর্‌ব। বল— আমাকে কি কত্তে হবে ?”

ঊষা স্বামীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া,— কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে একটুকু ইতঃস্তত করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া

ফেলিল "তুমি যদি বর হতে রাজি হও, তবেই সব গোলমাল কেটে যায়।"

ননীবাবু ঊষার প্রস্তাবে একেবারে অবাক বিস্ময়ে মস্তক নত করিল। শেষে উত্তেজিত স্বরে বলিল "ঊষা! তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার কি আর সময় পেলে না? আমি কি এখনও এতটা হীন তৃষ্ণা হৃদয়ে স্থান দিচ্ছি বলে তুমি মনে কর? অসিতবাবুর বিপদে আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে আছি। এ সময় এ সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে আমার মনে কষ্ট দিও না।"

ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "প্রিয়তম! আমি এ সময় তোমাকে পরীক্ষা কত্তে কখনও আসিনি। আশীর্ব্বাদ কর এরূপ প্রবৃত্তি যেন আমার মনে কোন দিনই স্থান না পায়। যা না করলে আর কোনই উপায় নেই— তা'র বেশী আমি তোমাকে কিছুই বলিনি। তোমার মত আমারও একটা কর্ত্তব্য রয়েছে। তোমার পার্শ্বে বসে, তোমাকে মহিমান্বিত করে তোলাও যে আমার

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত। তোমাকে ভালবাসি, সেই ভালবাসা যদি স্বার্থের কঠোর আবরণে জড়িত করে, কর্ত্তব্যের সাড়া পদ দলিত করাতে সহায়তা করি, তবে আমি স্ত্রী নামের নিতান্তই অযোগ্যা। জ্যাঠা মহাশয়ের মত প্রকৃত সুহৃদ আমাদের আর কেহ নেই বল্‌লেই হয়। আমাদের জন্য তিনি অযাচিত ভাবে কত কি-ই-না কচ্ছেন। তাঁর প্রত্যুপকার করা,—আর তাঁর অসীম ঋণ শোধ করবার অবকাশ, জীবনে আর কখনও আস্‌বে কিনা কে বল্‌তে পারে! যে একটি শুভ মুহূর্ত্ত লাভ করেছি, সামান্য ত্যাগের ভিতর দিয়ে, যদি সেই শুভ মুহূর্ত্তকে সাফল্য মণ্ডিত কর্ত্তে পারি, তার চেয়ে তৃপ্তি আর কিছুতে হবে বলে মনে করি না। আমি নারী তোমাকে উপদেশ দেওয়ার মত শক্তি আমার নেই,— যদি কিছু অন্যায় না বলে থাকি, তবে আমার উপরোধে তোমাকে এ কাজ কর্ত্তেই হবে। উপকারীর উপকার করবার পুণ্যাক্ষণকে, সামান্য স্বার্থের পুতিগন্ধের আড়ালে ফেলে, হাতছাড়া কর্ত্তে কিছুতেই মন চাইছে না।”

ননীবাবু উষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন "উষা! তুমি যা বল্‌ছ— তা ন্যায়ানুমোদিত হলেও, তোমার জীবন দুঃখভারাক্রান্ত করবার মত প্রবৃত্তি অনেক দিন হয় বিসর্জ্জন দিয়েছি। তোমাকে এতদিন যে কষ্ট দিয়েছি তারই প্রায়শ্চিত্ত আমার মজুত রয়েছে,— এরপর নূতন করে তোমাকে দগ্ধ করবার স্থায়ী আয়োজন করলে,— আমার গতি কি হবে, তাকি ভেবে দেখ্‌তে চেষ্টা করেছ?"

উষা স্বামীর গলদেশ দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া, কাতরতা পূর্ণ নম্র স্বরে বলিল "তুমি যদি আমাকে তোমার অন্তরের এককোণে স্থান দাও, তোমার ভালবাসার একবিন্দুও যদি আমাকে স্বইচ্ছায় বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ না কর,— তাতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আর বিবাহ না করে, যদি দৈবাৎ আমার প্রতি তুমি একটা তীব্র কটাক্ষ সংন্যস্ত কর, প্রতি মুহূর্ত্ত আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ, তাতেই যে আমার জীবন ধারণ করা নিতান্ত

দুঃসহনীয় হয়ে পড়্‌বে ' শুভা সতীন হ'লে আমি কোনই অমঙ্গলের আশঙ্কা করি না। সে যে আমার ভগ্নী, সে যে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে,— সে আমার জন্য কতবড় ত্যাগের দৃষ্টান্ত জগত সমক্ষে দাঁড় করাতে চাচ্ছিল! আমার কর্ত্তব্য আমি পালন কর্‌ব,— তার কর্ত্তব্য তা'র হাতেই রয়েছে। যদি ভগবান তাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করে, তবে সেটাকে বিধিলিপি বলেই মেনে নিতে হবে। মানুষের এতে কোনই হাত নেই,— যদি ত্যাগের ভিতর দিয়ে কর্ত্তব্যকে বড় করে গড়িয়ে তুল্‌তে পারি,— তবেই জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি কত্তে সক্ষম হব। সময় খুবই সংকীর্ণ,— বল তুমি স্বীকৃত হলে? এতে তোমার কোনই দোষ হবে না— এর গুরুভার আমিই স্বইচ্ছায় বরণ কত্তে বুক পেতে দিলুম।"

ননীবাবু ঊষাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া-- নীরবে চাহিয়া রহিলেন। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় ননীবাবুর বাক্যস্ফুরণ যেন বন্ধ হইয়া গেল।

ঊষা স্বামীকে নীরব দেখিয়া নম্রস্বরে বলিল

"তা হলে এতে তোমার কোনই অমত নেই বলে ধরে নিলুম ; এখন আশীর্ব্বাদ কর,— ওদের রাজী করাতে যেন কোনই কষ্ট পেতে না হয়। —তবে আসি।" বলিয়া ঊষা স্বামীর পদধূলী মস্তকে ধারণ করিল এবং দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊষার উদ্যোগে ও একান্ত আগ্রহে ননীবাবুর সহিত শুভার বিবাহ সুসম্পন্ন হইল।

ইহার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। অসিতবাবু একদিন সকলকে স্বীয় কক্ষে আহ্বান করিয়া, গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ঊষার অত্যাধিক আগ্রহ ও অচিন্ত্যনীয় ত্যাগের ফলে বিবাহ কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিতই সমাধা হয়ে গেছে। সেজন্য আমি চিরকাল ঋণী থাকব। আমার মত দুর্ভাগার পক্ষে

সেই ঋণের এক কণাও পরিশোধ করবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। তবে আমার যা সাধ্যাতীত নয়— অন্ততঃ উষার জন্য এরূপ কিছু করে, আমার অন্তরের অসীম উদ্বেগের প্রশমতা কত্তে চাচ্ছি। শুভার বিয়ে হয়ে গেছে,— আমাদের সংসার বন্ধন একরূপ কাটিয়ে ফেলেছি। পেন্সন বাবদ প্রতি মাসে যে টাকা পেয়ে থাকি,— তাতে আমাদের দুটি প্রাণীর জীবন যাত্রার পক্ষে খুবই যথেষ্ট বলে মনে করি। আমরা দু'জনাই এখন কাশীবাসী হব বলে ইচ্ছা করেছি। কাশীধাম যাত্রা করার পূর্ব্বে আমার বিষয় সম্পত্তির, একটা ব্যবস্থা করে যাব,— তাই আমি এই উইল প্রস্তুত করেছি। অদ্য হ'তে উষা আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেক মালীক হবে। আমার অবর্ত্তমানে, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমার স্ত্রীকে দুই আনি সম্পত্তির মালিক করে গেলুম। আর বাকী ননী ও শুভাকে দিয়ে গেলুম। ননী বাবাজীই সমস্ত সম্পত্তির ম্যানেজার হবে। এই উইল সংক্রান্ত কোন প্রতিবাদ আমি শুনতে ইচ্ছা

করি না। এই উইলের কোনই পরিবর্ত্তন আমাদ্বারা সম্ভবপর হবে না,— ইহাও জানিয়ে দিতে বাধ্য হলুম।"

সকলেই উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়া সহাস্য বদনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। ঊষা উইলের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়া,— অসিতবাবুর দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া, বাক্যস্ফূরণ করাইতে পারিল না। অসিতবাবু ঊষার মনোভাব উপলব্ধি করিয়া সহাস্য বদনে জানাইলেন "মা! এ বিষয়ে তুমি কোন আপত্তি উত্থাপন করলে আমি খুবই মনঃক্ষুন্ন হ'ব। মনে করব তুমি আমাকে পর মনে করে,—এ ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার কচ্ছ। লক্ষ্মী মা! এরূপ একটা ভাব আমার মনে যা'তে স্থান না পায়, তাই করে আমাকে সুখী করবে বলে মনে করি।"

ঊষা সমস্ত শুনিয়া, নত মস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। এই বিষয়ে আর কোন কথাই বলিতে সাহস পাইল না।

বেলা এগারটা বাজিয়া ছিল। ঊষা খোকাকে

কোলে করিয়া, শয়ন কক্ষের গবাক্ষ পার্শ্বে বসিয়া, আকাশের পাণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার মুখ চিন্তা-ম্লান। কি যেন একটা অশান্তি-বহ্নি অন্তরের নিভৃত স্থানে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শূন্যপথে চঞ্চল সমীরণ কোলে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড কাল মেঘগুলি, গতিহারার মত ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল। আবার যোজন বিস্তৃত ধাবমান মেঘের সহিত হঠাৎ মিশিয়া যাইয়া, অসীম একাকারের সৃষ্টি করিতেছিল। উষা সেই ভাসমান মেঘের গতির সহিত, জীবনের একটা সুসাদৃশ্য বাহির করিয়া, আপন মনে ভাবিতেছিল "আমরাওত সেই অসীম সৃষ্টি কর্ত্তার এক একটি অংশ, অনুকণা মাত্র! এক ঈঙ্গিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটাছুটি কচ্ছি। আবার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, এক মুহূর্ত্তে একাকারের সৃষ্টি কচ্ছি! এতবড় অসীম নিয়ম যিনি প্রবর্ত্তন করে-ছেন, তিনি কেন তাঁর সেই ক্ষুদ্র অংশের সৃষ্ট জীব গণকে বিভিন্ন পথের অনুসরণ করায়ে, বিভিন্ন মত পোষণ করাচ্ছেন? কেহবা সৎ কেহবা অসৎ বৃত্তি

গুলি স্বইচ্ছায় বরণ করে, কত বিসদৃশ্যের সৃষ্টি কচ্ছে ? কেহবা নিয়তিকে অবজ্ঞা করে, আত্মমত প্রবর্ত্তন কত্তে যেয়ে, একটা কিম্ভূত কিমাকারের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ কচ্ছে না ! যা হবার তা হতেই হবে, মানুষের চেষ্টা তা'র গতিরোধ কত্তে পারে না,—এই খাটি সত্য ধরে নিয়ে, ন্যায়ানুমোদিত পথে যদি মানুষ আপনাকে পরিচালিত কত্তে সক্ষম হয়, তবেইত সংসার শান্তি-ধামে পরিণত হতে পারে। এইত অনিত্য জীবন ! এ নিয়ে আমরা অভিমান, ঈর্ষা, দাম্ভিকতার প্রশ্রয় দিয়ে আপন ও পরের মিথ্যা পর্দ্দা টেনে, কতই না অনাচারের সৃষ্টি কচ্ছি ! তারপর এক মুহূর্ত্তে ভরা হাট ভেঙ্গে চূড়ে, ছাই, ভস্মের সৃষ্টি করে, কোন্ অসীমে মিশে যাচ্ছি !" হটাৎ চিন্তাস্রোতে বাঁধা দিয়া, শুভা আসিয়া ঊষার গলা জড়াইয়া বলিল "ঊষা দি ! তুমি এমনি বসে কি ভাবছ ?—আমায় বল্‌বে না,—না ?"

ঊষা একটুকু বিচলিত হইয়া, শুভার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল "বিশেষ কিছু নয়, মানুষের

মন, বিনা কাজে থাক্‌লে, উপরের দ্রুত ধাবমান মেঘের চেয়েও, দ্রুত ছুটে, কোথায় চলে যায়, তার কি সীমানা নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য ?”

শুভা প্রত্যুত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিল “না দিদি ! আসল কথা গোপন করছ, ঠিক করে বল, কি ভাবছ ? আমাকে পর ভেব না, তোমাকে অশান্তির হাত হ’তে রক্ষা কত্তে, কত চেষ্টাই না কল্লুম, কিন্তু ভগবান সে সব হ’তে দিল কৈ ? শেষে তুমিই আগ্রহ করে, নিজের অশান্তি নিজেই টেনে এনেছ।” বলিয়া শুভা চোখের জলের বাঁধ ছাড়িয়া দিয়া, ঊষার বুকে মুখ লুকাইল।

ঊষা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া, শুভার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া বলিল “বোন্ ! এরূপ কোন চিন্তা তোমার মনে স্থানই দিও না। আমি আজ খুবই সুখী বলে আপনাকে মনে করি, তবে আমি ভাবছিলুম তোমার নির্লিপ্ত ভাবের কথা ! তুমি আমাকে সুখী করবার জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কত্তে চাচ্ছ,

তা'তে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন !"

শুভা অতিকষ্টে আত্মগোপন করিয়া বলিল "সেকি দিদি ! আমিত ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।"

ঊষা দৃঢ়স্বরে বলিল "জ্যাঠাইমার নিকট শুন্‌লুম, তুমি নাকি আমাকে সুখী করবার জন্য, সন্ন্যাসিনী হ'তে চাচ্ছ। স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে, স্বামীর মূর্ত্তি এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে, সেই মন্দিরের পূজারিণী সেজে, তাঁ'র চরণ পূজার ব্যবস্থা কত্তে জেদ্ ধরেছ। আজ প্রায় পনর দিন হয় বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে তাঁ'র সাথে তুমি একটি কথাও বলনি। দেখা হলে দূরে দূরে সরে গিয়েছ। এসব সত্য নয় কি বোন ?"

শুভা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "হ্যাঁ দিদি ! তোমার একটা অমঙ্গল হয়, অশান্তি আনয়ণ করে, এমন কাজ কত্তে আমার ইচ্ছে নেই। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেছ, আমরাও ত একটা কর্ত্তব্য

রয়েছে। আমি যদি নিতান্ত নির্লিপ্ত থাকি, তাতে তোমার অনিষ্ট পাতের আপাততঃ আশঙ্কা থাক্‌লেও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমার যে উপকার করেছ, তার বিনিময়ে, এমনি করে স্বামীর স্নেহ কেড়ে নিয়ে, এতটা অপকার কি মানুষ কত্তে পারে ?”

ঊষা গম্ভীর স্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিল “এ যে তোমার ভুল ধারণা। মানুষ ইচ্ছা করলেই কারো শান্তি এনে দিতে পারে কি ? তুমি যা কত্তে চাইছ, তাতেই বরং বিপরীত ফল প্রসব করবে। শুভা ! চিন্তা করে দেখ, ভগবান এক, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁ’র সেবায় নিয়োযিত। সকলেই তাঁ’র সন্তুষ্টের জন্য প্রাণ পণে কত কি কচ্ছে। কেহ সুখের তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে, কেহবা শোক দুঃখের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে হাহাকারের রব তুল্‌ছে। কিন্তু তাঁ’র প্রতি আস্থা হারায়ে, তাঁকে কি কেউ ডাক্‌তে বিরত হচ্ছে ?”

শুভা ধীরে ধীরে বলিল “তা’ত মানুষের পক্ষে

সম্ভর পর নয়।”

ঊষা একটুকুন স্বর নামাইয়া বলিল “পৃথিবীতে স্ত্রীর স্বামীই একমাত্র দেবতা। তোমারও যিনি দেবতা, আমারও তিনিই দেবতা। আমরা দু'জনাই তাঁ'র সেবায় নিয়োযিত হই, এই হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছে। সেই অভিলাষ পূরণে বাঁধা দিতে গেলে,—দেবতারই প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হবে। বাস্তব জিনিষ পরিত্যাগ করে, ভাস্কর রচিত মূর্ত্তির পরিচর্য্যায় কোন তৃপ্তি পাওয়া যায় কি? সাক্ষাৎ দেবতাকে ঠেলে ফেলে, নকল নিয়ে, কে কবে উৎকর্ষতা লাভ কত্তে সক্ষম হয়েছে? আজ ক'দিন যাবত তাঁ'র মুখের অবস্থা দেখে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। কি যেন একটা অব্যক্ত অশান্তিতে তিনি অতৃপ্তি অনুভব কচ্ছেন। আমরা যদি অন্তরের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত অসুবিধা ঠেলে ফেলে দিয়ে,—তাঁকে সন্তুষ্ট কত্তে না পারি, তবে আমাদের জীবনের সার্থকতা কোথায়?” বলিয়া ঊষা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইল। শেষে নয়নের অশ্রুজল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া

ফেলিয়া, আবার বলিতে লাগিল "বোন! তিনি মানুষ হলেও আমাদের দেবতা। মানুষ মাত্রেরই কোন না কোন সময় ভুল হতে পারে। রাগ, দ্বেষ মানুষের অল্প বিস্তর থাক্‌বেই, যদি দৈবাৎ সেই সমস্ত রিপুর দোষে তিনি কোন অপ্রতিকর কিছু করে বসেন, তা'র বিচার করবার আমরা কে? ভগবান্‌ যে ভাবে নিয়োযিত করেছেন, সে ভাবেই কাজ কত্তে হবে। যদি মনে প্রাণে সেই একদিক লক্ষ্য করে, স্বার্থের পূতিগন্ধের হাত এড়ায়ে চল্‌তে পারি,— তবে অশান্তির আশঙ্কা কিছুই থাক্‌তে পারে না।"

শুভা চক্ষের জলের বাঁধ ছাড়িয়া দিয়া, উষার চরণে মস্তক লুটাইয়া দিল, এবং অতিকষ্টে আত্মস্থ হইয়া, উষার গলা জড়াইয়া বলিল "দিদি! আমাকে ক্ষমা কর,—আমি এসব কিছুই বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনি। আজ হতে প্রতিজ্ঞা করলেম,— তোমার উপদেশ ছাড়া কোন কাজই করব না। তোমার মত দিদি ক'জনার ভাগ্যে ঘটে থাকে? আজ হ'তে আমার

মনের সংকল্প পরিত্যাগ করলেম।"

—()—

উপসংহার।

—*—

সেদিন বেলা বারটায় ননীবাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, আফিস হইতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং স্বীয় কক্ষের চেয়ারে উপবেশন করিয়া, রুমালে ঘর্ম্মস্রাব মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

উষা স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, একখানা পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিল। শেষে ধীরে ধীরে শরীরের সমস্ত পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া নম্রস্বরে বলিল "বড্ড কষ্ট হয়েছে,— না? এত রোদে আর তুমি কখনও হেটে বাসায় এস না। আজই জ্যাঠা মশায়কে বলে গাড়ীর বন্দোবস্ত করাব। নিজের শরীরের দিকে কোন দিনই তোমার লক্ষ্য থাকে না।" বলিয়া উষা স্বামীর স্নানের ব্যবস্থা করিবার

উদ্দেশে, ননীবাবুর কোলে খোকাকে তুলিয়া দিল, এবং পাখাখানি শুভার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "বোন! তুমি বাতাস কর, আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি। বলিয়া ঊষা বাহিরে চলিয়া আসিল।"

শুভা লজ্জাবনত মস্তকে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া বাতাস করিতে লাগিল। ননীবাবু শুভাকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "শুভা! আজ যে ব্রত ভঙ্গ করে, একেবারে আমার নিকট এসে দাঁড়িয়েছ?"

শুভা নীরবে দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল এবং সহাস্য বদনে বলিল"এইত আমার ব্রত।"

ননীবাবু স্মিত মুখে বলিলেন "কবে হ'তে? তোমার সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা কবে হ'বে আমার জানতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।"

শুভা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে, পূজারিণী রূপেই যে আজ তোমার নিকট হাজির হয়েছি।" বলিয়া শুভা, ঊষার প্রদত্ত

সমস্ত উপদেশের সারাংশ স্বামীর নিকট বিবৃত করিল।

ননীবাবু ধীরে ধীরে, বাম হস্ত প্রসারণ করিয়া, শুভাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন। শুভা স্বামীর বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া, অপলক নয়নে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার বহু দিনের তৃষিত চিত্ত, আশ্রয় লাভ করিয়া যেন শান্ত হইল। আর খোকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে শুভার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এমনি সময়ে উষা নীরবে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। শুভা ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, স্বামীর বাহু বন্ধন হইতে মুক্তি লইয়া, খোকাকে বুকে করিয়া এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং খোকার মুখে ঘন ঘন চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া, তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

সেই দৃশ্যে উষার চোখ, মুখ হর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ত্যাগের ভিতর দিয়া, অসীম সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া, উষা তৃষিত নয়নে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ননীবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উষাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া প্রীতি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন "উষা! তুমিই ধন্য, আর আমি তোমার স্বামী বলে আপনাকে খুবই গৌরবান্বিত মনে কচ্ছি। আমার ত্র্যহস্পর্শ দিনের যাত্রার ফল, তোমার যত্নেই, শেষটায় এতটা মধুময় হয়েছে।"

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে এক ভিখারী, সেতারা বাজাইয়া গাইতে লাগিল :—

সবায় ভাবে, নিজের তরে,
পরের তরে ভাবছে ক'জন?
মনের ধোঁয়া মুছিয়ে নে দেখ,
কেই বা রে পর,— কেই বা আপন!
ভোগ-তৃষায় কে, পায় কবে সুখ?
ত্যাগেই ঘুচে, জীবনের দুঃখ!
এ-দুনিয়ায় সেই-ত সুখী,
পরকে যে জন, করছে আপন!

—————o()o—————

সমাপ্ত।